চৌচির

আবুল ফজল

বুলবুল পাবলিশিং হাউস
২৩ ক্রেমেটোরিয়াম ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বন্ধু দিদারুল আলম স্মরণে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

নবাব, আমীর, বাদশাহ্
(গল্প-গ্রন্থ)

খেয়ালের খেলা
(গল্প-গ্রন্থ)

আমাদের প্রিয়া
(গল্পে-উপন্যাস)

একটী সকাল
(নাট্য-গ্রন্থ)

১৯২৪-২৫এর দিকে এই গল্পটী লেখা হয়। এই গল্পের নামকরণ করেছেন 'হারামণি'র মণিকার বন্ধু মনসুর উদ্দীন এম-এ ; নায়ক তার নামের জন্য আমার অন্যতম বন্ধু সুসাহিত্যিক কামালউদ্দীন খাঁ'র কাছে ঋণী। এই লেখাটী সব চেয়ে প্রিয় ছিল প্রতিভাবান সাহিত্যিক মরহুম দিদারুল আলমের ;—দিদার ছিল আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তার শক্তির ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই মাত্র ছাব্বিশ বৎসরে তার সংগ্রামশীল বিচিত্র সুন্দর জীবন অকস্মাৎ দাঁড়ি টেনেছে। বইটী তার প্রিয় ও আমার প্রথম ব'লেই তার স্মৃতি স্মরণ ক'রে উৎসর্গ করলাম।

নবীন মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার খবরদারীতে অগ্রণী আমার জীবনের অন্যতম দোসর কবি-বন্ধু আবদুল কাদির, 'বুলবুল' সম্পাদক সোদর-প্রতিম মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ ও অবিনাশ প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ মহাশয়ের সাহায্য ও সহৃদয়তা না হ'লে এই বইর প্রকাশ অসম্ভব হতো। সুদূর মফস্বলে থেকে কলকাতা হ'তে ছাপিয়ে বই বের করায় ক্রটী ঘটেছে অনেক, তার জন্য আমার অবস্থা ও আমি দায়ী ;— তদ্‌সত্ত্বেও এর ছাপা ও তৈরীতে যদি কিছুমাত্র প্রশংসনীয় থাকে তার হক্ উপরি-উক্ত বন্ধুদের।

আবুল ফজল

চৌচির

তস্‌লীম তখন বালক মাত্র—তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। পিতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া, চকবাজারের মিঞাবাড়ীতে বলিয়া কহিয়া তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই হইতে সে-বাড়ীতে থাকিয়া তস্‌লীম ম্যাট্রিক ও আই-এ পাশ করিয়াছে, বি-এ পাশ করিয়া মাত্র গত বৎসর ল' পড়িবার জন্য কলিকাতা গিয়াছে। কবে কোন্ তারিখে সে মিঞাবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল সে-কথা তাহার মনেও নাই—এই দীর্ঘ দশ এগার বৎসর ধরিয়া সে বেগম সাহেবার স্নেহে মানুষ হইয়াছে। নূতন চাকর চাকরাণীরা সবাই জানে সেও এ বাড়ীর ছেলে। আত্মীয়স্বজনেরা মনে করে সেও তাহাদের একজন।—বেগম সাহেবার বড় দুই মেয়ের বিবাহ হইয়াছে—বাড়ীতে আছে দুইটী ছেলে আর সর্ব্বকনিষ্ঠা মেয়ে

রওশন। তস্‌লীম যখন প্রথম এ-বাড়ীতে আসে তখন রওশনের বয়স চার পাঁচ বৎসরের বেশী নয়। প্রথম দর্শনেই এ সুদর্শন ছেলেটির উপর যেন বেগম সাহেবার লোভ হইয়াছিল। সেই হইতে তাঁহার মনে কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল—এ দুইটীকে একদিন মিলাইয়া দিয়া তামাশা দেখিতে হইবে। তাই বোধ হয় এ পরের ছেলেটিকেও তিনি ধীরে ধীরে নিজের করিয়া লইতে ছিলেন।

কয়েক বৎসর পরের কথা—

বেগম সাহেবা হঠাৎ অসুখে পড়িয়া গেছেন, একেবারে যায় যায় অবস্থা। বালিকা রওশন ও কিশোর তস্‌লীমের মুখের দিকে তাকাইতেই অশ্রুধারায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিয়া যাইত। তাঁহার বড় সাধের আশা, তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না—এ ভাবিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া যাইতেছিল।

বাইশ তারিখ তস্‌লীমের কলেজ খুলিবে, তাহাকে ত আর

রাখা যায় না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার এ আশা এরা ফলবতী করিবে কিনা কে জানে?

সন্ধ্যায় যখন কেহই কাছে ছিল না, তিনি তস্‌লীমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তস্‌লীম জুতা টিপিয়া টিপিয়া আসিতে-ছিল—এর ভিতর রহস্য আছে মন্দ নয়। এ-সব ব্যাপারে যাহারা অনভ্যস্ত তাহাদের জন্য এটাও একটু চুপি চুপি বলিতে হইতেছে। ছোটকাল হইতে রওশন শুনিয়া আসিতেছিল তস্‌লীম ভাইয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। শিশুকাল ত এ নিয়া বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাহার কাটিল কিন্তু সাত আট বৎসর বয়স হইতেই কোথা হইতে অপরিসীম লজ্জা আসিয়া তাহাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই হইতে তস্‌লীমকে দেখিলে সে যেদিকে পারিত ছুটিয়া পলাইত। এ পলায়নের ছুটাছুটিতেও যেন তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে পথে পথে আনন্দ ঝরিয়া পড়িত। ওদিকে তস্‌লীমের বড় ইচ্ছা ঐ সুকুমার নিপুণ শিল্পীর অঙ্কিত সুন্দর মুখচ্ছবিখানি একবার দেখিয়া লয়। পাছে তাহার জুতার শব্দে বালিকা দৌড়িয়া পলায় তাই সে আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া অন্দরে

ঢুকিত—পলাইতে পলাইতেও হয়ত এক নজর দেখিয়া লওয়া যাইবে!

এ-সব পাকা গৃহিণী বেগম সাহেবার দৃষ্টি এড়াইত না—তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটুখানি হাসিয়া বলিতেন: 'তস্‌লীম হাঁট্‌লে পিঁপ্‌ড়ায়ও খবর পায় না।' তস্‌লীমও লজ্জাজড়িত কণ্ঠে অতি সঙ্কোচের সহিত বলিত: 'বেশী টাকার জুতো, মা, আওয়াজ হয় না।'

•

রোগশয্যায় এ-সব একটার পর একটা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছিল—আর তাঁহার দুই পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া বালিশ ভিজিয়া যাইতেছিল।

তস্‌লীম ঘরে ঢুকিতেই রওশন তাড়াতাড়ি পাখা ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইবার জন্য উঠিয়া পড়িল—হঠাৎ একখানি রুগ্ন দুর্ব্বল হস্ত তাহার হাত ধরিয়া টানিল: 'বোস মা, আমার মাথায় একটু হাত দাও।' তাহার লজ্জাধারকে সম্মুখে দেখিয়া সেও যেন আজ মন্ত্রাকর্ষিতার মত নড়িতে পারিল না—নীরবে জড়সড় হইয়া কোণ ঘেষিয়া বসিয়া পড়িল।

তস্‌লীমকে ইঙ্গিত করিতেই সেও রোগীর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল।

—'বাবা, আমাকে একটু তুলে বসাও।'

তস্‌লীম তাঁহাকে তুলিয়া বসাইল। তিনি উভয়ের মাঝখানে বসিয়া দুই শীর্ণ হাত দুইজনের কাঁধের উপর রাখিলেন। তাঁহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। মুখে শুধু বলিলেন: 'এ-ত আমার বেহেশ্‌ত্‌।' তস্‌লীমের সমস্ত দেহের ভিতর প্রতিধ্বনি হইতেছিল, মহানবী যাঁহার চরণতলে স্বর্গ বলিয়াছেন এই-ত তিনি।

ধীরে ধীরে রওশনের হাতখানি তস্‌লীমের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন: 'আমার এ দান প্রত্যাখ্যান করিস্‌ না, বাপ্‌!' লজ্জাসরমে অভিভূত রওশন যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল, অথচ মুখে কিছু বলিতে রা ফুটিতেছিল না। তস্‌লীম তাহার আবাল্যবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র হাতখানি নিজের হাতের ভিতর পাইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, মা না থাকিলে হয়ত চুম্বনের পর চুম্বন দিয়া সে ছোট্ট ফুলের মত হাতখানিকে ভরিয়া দিত। এখন ছাড়িয়া দিবে কি

ধরিয়া রাখিবে ঠিক পাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে বালিকা নিজেই হাতখানি টানিয়া লইয়া এক দৌড়ে পলাইয়া বাঁচিল।

তারপর অনেকদিন গত হইয়াছে। বেগম সাহেবাও অনেক ভুগিয়া এবারের মত রেহাই পাইয়াছেন। তস্‌লীম বন্ধে আসিত, কিছুদিন এখানে কিছুদিন নিজবাড়ী ঘুরিয়া কলিকাতা ফেরৎ হইত। কবে দিন আসিবে এ অপেক্ষা!

বালিকা রওশনও জীবনের এমন সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যখন অনাগত জীবনের সব কিছু মানুষের শিরায় শিরায় কাণাকাণি করিতে থাকে। একটা রঙ্গীন স্বপ্নে সারা অঙ্গ মশ্‌গুল হইয়া উঠে—যেন 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—'

রওশনের ইচ্ছা হয় তস্‌লীমকে দুই চোখ ভরিয়া দেখে—শৈশবের মত হাত ধরিয়া আবার কাছে কাছে ঘুরে কিন্তু পারা যায় না, দৌড়িয়াই পলাইতে হয় কেমন একটা অজানা শক্তি আসিয়া তাহাকে পলায়নের পথে ঠেলিয়া দেয়।

বেগম সাহেবার ইচ্ছা তাহারা মিশুক, এখন হইতে জানাশোনা শুরু হউক। বন্ধে তস্‌লীম আসিলেই তিনি তাহার কাছে রওশনের পড়ার ব্যবস্থা করিতেন। বালিকার মনের ভিতর তস্‌লীমের কাছে পড়িবার অদম্য ইচ্ছা থাকিলেও পা কিছুতেই সরিতে চাহিত না। আজকাল তস্‌লীমের চোখের সামনে তাহার পা অচল হইয়া যাইত, হঠাৎ তস্‌লীমের সামনে পড়িয়া গেলে কিছু ধরিয়া কোণঠাসা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তসলীমটাও দুষ্ট কম ছিল না, কেহ নাই দেখিলে বালিকার পিঠের উপর একটা ছোট কিল্ অথবা একটা চিম্‌টি কাটিয়া চলিয়া যাইত। একদিন দুপুর বেলা তস্‌লীম ঘরে ঢুকিয়া দেখে কেহ নাই, সব অন্দরের পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছে। রওশন ভাত খাইতেছিল—তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভাতের থালা ফেলিয়া এক কোণায় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তসলীমের মাথায় দুষ্টামি খেয়াল চাপিল, কাছে একটা ভরা লোটা ছিল তাহাই নির্ব্বিবাদে বালিকার মাথার উপর ঢালিয়া দিল—শাড়ী ফুঁড়িয়া কালো চুলের গোছা অধিকতর কালো হইয়া ফুটিয়া বাহির হইল। তস্‌লীমের বড় ইচ্ছা হইতেছিল ঐ কালো চুলগুলি স্পর্শ করে। কিন্তু

বামাল ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া পলাইতে হইল।

বালিকা সরমে মরিয়া হইয়া অচল পদার্থের মত দাঁড়াইয়া রহিল—ঐ জলের ভিতর দিয়া কোন্ অজানা স্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক-রোমাঞ্চ তুলিয়াছিল তাহা সে জানে না।

মা আসিয়া—'কে রে ?'—বলিতেই বালিকা অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল, 'জালাল'। জালাল তাহার ছোট চাচাতো ভাই। 'বাঁদরটা আসুক'—বলিয়া গৃহিণী ভাত বাড়িতে বসিয়া গেলেন।

অনেক ঠেলাঠেলি ও পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন রওশনকে তস্‌লীমের সম্মুখে আনান গেল না, তখন অগত্যা তস্‌লীমকেই রওশনের সম্মুখে আনার ব্যবস্থা হইল। রওশনকে খালি ঘরে আগে বসাইয়া তস্‌লীমকে ডাকা হইল। তস্‌লীম ঢুকিয়া দেখে একটি কাপড়ের বোচ্‌কার সম্মুখে একখানা দ্বিতীয় পাঠ।

প্রত্যেক দিন এই দেড় হাত ঘোমটা লইয়া টানাটানি করিতে করিতে এবং ছোট্ট ছোট্ট কিল্ চাপড় ও চিম্‌টির

সদ্ব্যবহারে লজ্জার গাঙে যেন একটু একটু ভাটা পড়িতে লাগিল। বইটা তাহার সম্মুখে খুলিয়া রাখিত মাত্র, বাহিরে কাহারও পদধ্বনি শুনিলে তস্‌লীম একটু জোরে জোরে বলিত, পড় পড়, এবং নিজেই আগে আগে—ভল্লুক দেখিয়া এক বন্ধু লাফাইয়া গাছে চড়িয়া বসিল—ইত্যাদি পড়িয়া যাইত।

তস্‌লীম কত কথা পাড়িত, বালিকা প্রথম প্রথম চুপ করিয়া থাকিত, শেষে হুঁ হাঁ না ইত্যাদি উত্তর দিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। তস্‌লীমের ব্যাকুল মন আরও দীর্ঘ উত্তর শুনিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বহু সাধ্য-সাধনায় বাহির-করা এক একটী শব্দ যেন তাহার কানে সুধাবৃষ্টি করিত।

লেখা শিখাইবার নামে তস্‌লীম অবলীলাক্রমে সিলেটে নিজের মনের কথা লিখিয়া যাইত; সে-সব কথার আদিও নাই অন্তও নাই, লেখকের লিখিয়া পরিতৃপ্তিও নাই এবং পাঠিকার পড়িবার উৎসাহেরও শেষ নাই, এ যেন যত চলে ততই লাভ।

তস্‌লীম তাহার স্বাভাবিক নিয়মে লিখিত না; ধীরে

ধীরে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পরিষ্কার ভাবে, পড়িতে যেন শিশুরও না ঠেকে এমনি ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া লিখিত। বালিকা রওশনের বিদ্যার দৌড় কতদূর জানিয়াই তাহার এ কষ্ট-স্বীকার। প্রথম প্রথম রওশন শুধু পড়িয়াই চুপ থাকিত, বহু সাধ্য-সাধনায়ও কিছু লিখিত না। পরে 'হাঁটি হাঁটি পা পা গোছ' আরম্ভ লইল— প্রথম শব্দ, তারপর বাক্য, তারপর আরও বাড়িয়া চলিল। এখন লেখা-পড়া ঐ পর্য্যন্ত; পড়িতে বসিলে সিলেটে লেখালেখি করিতে করিতে কখন যে দশটা বাজিয়া যায়, তাহা তাহারা টেরও পায় না। অগত্যা ঘড়িটা যে খুব ফাষ্ট চলে এবং শীঘ্রই যে ইহার মেরামতের দরকার আছে, এ মন্তব্য করিয়া বড় অনিচ্ছার সঙ্গে তস্‌লীমকে উঠিয়া যাইতে হইত। না হয় এখনই খাওয়ার জন্য ডাকিতে বেগম মা নিজেই আসিয়া পড়িবেন!

•

যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই নাকি সন্ধ্যা হয়।

বেগম সাহেবা যে-ভয়টা মনে মনে পুষিতেছিলেন, শেষকালে সেই ভয়টাই প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বামী বাঁকিয়া বসিলেন।

চৌচির

রওশনের বাপের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে গেলে বইয়ের চাইতে ভূমিকা বড় হওয়ার মতো ব্যাপার হইয়া পড়িবে। অথচ না বলিলেও যে-ইতিহাসটা বলিতে বসিয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবেই বলিতেছি।

সে অনেক দিনের কথা, মানুষের স্মৃতি ততদূর সঠিক যাইয়া পৌঁছে না। রওশনের মাতামহ অর্থাৎ চকবাজারের বিখ্যাত মিঞা-পরিবারের শেষ বংশধর সৈয়দ আবদুল করীম মিঞা পরলোকগমন করিয়াছেন, সে প্রায় চল্লিশ বৎসর। তাহারও পূর্ব্বে তাঁহার ষ্টেটে তহ্‌শীলদারদের তদারক করিবার জন্য বাঁশবাড়িয়া গ্রামের ফকীর মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি ম্যানেজার স্বরূপ ছিলেন। লোকটার পেটে বিদ্যা বেশী না থাকিলেও মগজে বুদ্ধি বেশ ছিল। তদুপরি অটুট স্বাস্থ্য এবং সুন্দর চেহারা তাহার সহায় ছিল। করীম সাহেব মৃত্যুর সময় এক স্ত্রী, দুইটী শিশু-কন্যা ও একটী শিশু-পুত্র রাখিয়া যান। এখন এ অসহায় পরিবারের ভার নিমক-হালাল্ চাকর ফকীর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। তিনি সব সময় বলিতেন ঃ কি আর করি!

খোদা আমার উপর এ বা'লা নাজেল করিয়াছেন—হাদীছ-শরীফে নাকি আসিয়াছে, যে ব্যক্তি বিধবার নেগাহ্‌বাণী করে না, হাশরের দিন হজরত তাহার জন্য সুপারিশ করিবেন না, হজরতের মা ও তাঁহার প্রথম প্রিয়তমা ছিলেন বিধবা। আর খোদা সব গোণাহ্‌ মাফ করিবেন, কিন্তু আফসোস্‌ ঐ ব্যক্তির জন্য—যে নিজের মনিবের এতিম বাচ্চাকে বে-অছিলায় ছাড়িয়া যায়।...কাজেই তাহার না থাকিয়া উপায় নাই। বিধবা বেগমের নামে জমিদারী শাসিত হইতে লাগিল।

দিনের পর দিন গড়াইয়া যায়—পুরাতন স্মৃতিও ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া ওঠে।

ফকীর মোহাম্মদ লোকটী পরহেজগার। তাই লোকে যথার্থই বলিত, খোদাপরস্ত্‌ লোক না হইলে মৃত মনিবের জন্য এত করে! তিনি এখন হইতে সকালে ফজরের নমাজের পর এক পারা কোর্‌আন-শরীফ ও হাজত-কবুলের অজীফা-টা শেষ না করিয়া কোনদিন মসজিদের বাহির হন না। একদিন রাত্রিতে এশা'র নমাজের পর তিনি সুরা য়াসিন বার কয়েক পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট নফল্‌ নমাজের

উপর আরও চারি রাকাৎ পড়িলেন। নির্দ্দিষ্ট তেলাওতের উপর আরও বেশী তেলাওৎ ও অজীফা পড়িয়া বাহির হইলেন। মসজিদের পার্শ্বেই কবরস্থান। আজ তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া মরহুম সৈয়দ করীম সাহেবের কবর জেয়ারত করিলেন। তারপর আসিয়া বাড়ীর এক বর্ষীয়সী চাকরাণীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

পুরাতন চাকরাণী মনিবের মেজাজ বুঝে—কল্কি লইয়া বসিল।

ফকীর সাহেব মুখ টিপিয়া হাসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কি খবর ?'

ফুলীর মা বলিল: 'কিছুই বলে না, শেষে বল্‌ছে কিছুদিন পরে জওয়াব দিবে।'

তারপর বৃদ্ধ ফকীর সাহেব দাড়ির ভিতর আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ফুলীর মা'কে রিহার্স্যাল দিতে লাগিল—সে কেমন করিয়া বেগম সাহেবাকে বুঝাইয়া দিবে: উপরে এক খোদা আর নীচে ফকীর সাহেব ছাড়া তাহাদের আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তাহার সাহায্য না হইলে যে এ-সম্পত্তি চোর ডাকাতে লুটিয়া লইবে, আর এ

এতীম ছেলে-মেয়েগুলিকেই বা কে মানুষ করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।—ফুলীর মা'র কিছু মনে থাকে, চৌদ্দ আনা থাকে না।

বিধবা বেগম সাহেবার ভাবনার অন্ত নাই—অতীত জীবনের স্মৃতি একে একে মনের কোণে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। পিতামাতা দেবতুল্য স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন, সে অনেকদিন। এমন রূপ-গুণ-সম্পন্ন স্বামী কয়জনের ভাগ্যে জোটে? অতুল সম্পত্তি, পুত্র কন্যা সবই তাঁহার আছে—মানুষ যাহা কিছু পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে, সে সবের তাঁহার অভাব ছিল না, এখনো নাই। তবে আজ এমন হইল কেন? একজনের অভাবে সব সুখ-শান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল? সম্পত্তি শাসনের জন্য—নিজের পুত্র কন্যার আদর আব্দার পূরণের জন্য আজ তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। রাগ হয়, যিনি তাঁহাকে এ অবলা নারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার উপর। এ যে বাড়ীর চতুর্দ্দিকের ঘেরা দেওয়াল; তার বাইরে যাইবার, তহ্‌শীলদার কর্ম্মচারীদের

সঙ্গে কথা বলিবার, টাকা পয়সার হিসাব লইবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। কেন এ অবিচার?

মনে পড়ে পাশের বাড়ীর উকীল বরদাবাবুর এক কন্যা বিধবা হইয়াছে। এক ছেলের মা মাত্র, তথাপি কি নির্ভীক ভাবে সে নিজের স্বামীর সম্পত্তি শাসন করিতেছে। নিজের চোখে সমস্ত হিসাব-পত্র দেখে, নিজেই তহ্‌শীলদার ম্যানেজার প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে, আদেশ উপদেশ দেয়। তাহার পিতামাতা তাহাকে স্কুলে পাঠাইয়া ইংরাজী বাংলায় ভালো করিয়া শিক্ষিতা করিয়াছিলেন।—এ চিন্তার সূত্র ধরিয়া বেগম সাহেবার রাগ যাইয়া পড়িল মৃত পিতামাতার উপর, কেন তাঁহারা তাহাকে শিক্ষা দীক্ষা দেয় নাই? এ পিঁজরার পাখী করিয়া রাখিয়াছিল? আজ সে তাহার স্বামীর সম্পত্তি, এতিম বাচ্চাগণের হক্ রক্ষা করিতে পারিতেছে না,—পর ত পর—তাহারা যে সব নষ্ট করিতেছে না, তাহা কে জানে?

তাহার বেতনভোগী চাকর, একদিন তাহার একটুখানি মেহেরবাণীর ভিক্ যাহাকে স্বর্গসুখ দিত, আজ সে তাহার এ অসহায় জীবনের দুর্ব্বলতার আশ্রয় লইয়া তাহার

কাছে স্বামীত্বের আর্‌জী পেশ করিয়াছে। রাগে এবং ঘৃণায় তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল—এ স্তব্ধ নিশীথে নিঝুম গৃহতলে বসিয়া তাঁহার সমস্ত অন্তর ধুকিয়া ফরিয়াদ করিয়া ফিরিতেছিল, সে সুপ্ত নিশার যিনি মালিক তাঁহার চরণতলে—।

পালঙের উপর সুপ্ত শিশু পুত্র-কন্যার মুখের দিকে চাহিতেই তাঁহার মনে যেন আবার নূতন চিন্তার উদ্রেক হইল। মনে হইল: ফুলীর মা ত মিথ্যা বলে নাই, আমাদের দারুণ দুর্দ্দিনের সময় যখন কেউ কাছে আসিয়া দাঁড়াইবার লোক ছিলনা, তখন চাকর হইলেও ফকীর ত সমস্ত বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে; আজিও ত তাহারই চেষ্টায় সম্পত্তি শাসিত হইতেছে। আজ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে যদি বাঁকিয়া বসে—সে যদি শত্রুতা করিতে লাগিয়া যায়, তাহার স্বামীর সম্পত্তি কে দেখিবে, কে তাহার এতীমদের হক্ রক্ষা করিবে?—সারা রাত তাঁহার ঘুম হইল না। হতভাগিনী নারী কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সারাটা রাত কাটাইলেন।

চৌদ্দ

ফকীর মুন্‌শীর এবাদতের পরিমাণ বাড়িয়া গেল—বেলা নয়টায়ও এখন তিনি মস্‌জিদ হইতে বাহির হন না; আর ঐ দিকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মস্‌জিদে তাঁহার আওয়াজ শুনা যায়। এবাদতে নাকি মানুষের দিলের ময়লা কাটিয়া যায়। বাতেনী কথা বলা মুশ্‌কিল, কিন্তু জাহেরী ময়লা কাটিয়া যায় একথা মুন্‌শী সাহেবের মধ্যে দেখা গিয়াছে। দিন দিন তাঁহার কাপড় চোপড় পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। দুই একটা কাপড় ধোপার বাড়ী ঘুরিয়াও আসিতে লাগিল। এক জোড়া নূতন জুতাও কিনিলেন। আগে সারাজীবন তিনি চার পয়সা দামের কিশ্‌তী-টুপি মাথায় দিতেন—এখন আট আনা দিয়া এক গোলগাল ভদ্রগোছের টুপিও কিনিয়া ফেলিলেন। তাহার এ পরিবর্ত্তনে বেকুবেরা হাসিল, বুদ্ধিমানেরা মনে করিল পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল।

সেদিন জুমা-বা'দ মুন্‌শী সাহেব মোয়াজ্জেনকে ডাকিয়া বলিলেনঃ দেখুন মোয়াজ্জেন সাহেব, রবিবার দিন আমার দশজন মোল্লার দরকার, এই একটু কবর জেয়ারৎ আর দাউতে-মকবুল পড়াতে চাই।

তারপর হাঁকিলেন : এ কালাই, একটু তামাক দে'রে।

—তা'রা খুব সকালে আস্‌বে, এসেই সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীর দরগায় জেয়ারতে যাবে, সেখান থেকে এসে খেয়ে দেয়ে জোহরের নমাজের পর বদর শাহে'র দরগা, আমানত শাহে'র দরগা, মেহেরুল্লা শাহে'র দরগা, কদম মোবারেক—এমনি শহরের সব দরগা গুলি জেয়ারাৎ কর্‌বে, তারপর এসে দাউৎ পড়বে। হাঁ, বড় মৌলবী সাহেবকেও ব'লে আস্‌বেন—রাত্রে খাওয়ার পর মৌলুদ হবে।

মোয়াজ্জেন সাহেবের মুখ হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আরামের সঙ্গে বলিলেন : আচ্ছা। খয়রাৎ কত ক'রে দিবেন ? খয়রাতের কথা আগে না বল্লে আজকাল ওরা আসতে চায় না কিনা ; সবাই ঠকায় যে।

ফকীর সাহেব বলিল : তা ব'লে আমিও ঠকাবো নাকি ? একটা বিবেচনা ক'রে দেবো আর কি।

দুনিয়ার সব আদালতে ঘুষ চলে—সব হাকিমের যিনি বড় হাকিম, তাঁর আদালতে আরও বেশী চলিবার কথা।

বেগম সাহেবাকে জানান হইল, রবিবার দিন মরহুম

চৌচির

সৈয়দ সাহেবের ওফাতের দিন ; ঐ দিন তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থে মৌলুদ ও জেয়ারৎ হইবে। তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর এ স্মৃতিপূজায় বেগম সাহেবার দেহ-মন উন্মুখ হইয়া উঠিল—তিনি প্রাণ ঢালিয়া যোগাড়-যন্ত্রে লাগিয়া গেলেন। আজ তাঁহার দেহ মনে যেন জোয়ার আসিল —সব যেন তিনি ভাসাইয়া দিবেন। দাস-দাসীদের ডাক হাঁক নাই, সব দিকে নিজেই ছুটিয়া যান, নিজ হাতেই সব কিছু করিতে চান। সকালে ছেলেমেয়ে গুলিকে গোসল করাইয়া ভাল জামা কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন—আজ যেন কিসের উৎসব। নিজেও গোসল করিয়া আসিলেন—কিসের এক পুলকানন্দে তাঁহার সারা দেহ যেন রোমাঞ্চিত হইতেছিল। আজিকার আলো-বাতাসে যেন তিনি তাঁর স্বর্গগত স্বামীর ছোঁয়া অনুভব করিতেছিলেন। মনে পড়িতেছিল তাঁহার প্রথম বিবাহ-দিনের কথা ; তখনো স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয় নাই, তথাপি কোন্ অজানা স্পর্শ-সুখে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত, কোন্ অদৃশ্য সুন্দরের পরশ-সুখে তাঁহার সারা দেহে রোমাঞ্চ খেলিয়া যাইত। আজও মনে হইতেছে যেন তাঁহার স্বামী

অদৃশ্যলোকে থাকিয়া সব কিছু দেখিতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি-ছোঁয়া আসিয়া যেন তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ তুলিতেছে। নিজের ময়লা অঙ্গবাসের প্রতি চাহিয়া তাঁহার লজ্জা হইতেছিল, ফুলীর মা'কে ডাকাইয়া তিনি মাথা আঁচড়াইতে বসিলেন—দুই বৎসর পরে আজ প্রথম তাঁহার মাথায় তৈল চিরুণী উঠিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভাল কাপড় পরিলেন।

ভিতরের কথা এক ফুলীর মা ছাড়া আর কেহই জানিত না—ফুলীর মা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিল এবং নিজে একা হাসিয়া যেন তাহার পরিতৃপ্তি হইল না। বেগম সাহেবার কেশ-বিন্যাস করিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির-বাড়ীতে ফকীর সাহেবকে সংবাদ দিল—কাজ ফতে। ফকীর সাহেব এক গাল হাসিয়াই বলিলেন: দূর, তাও কি হয়?

—আপনি নিজেই দেখে আসুন্ না! আজ বাহিরের উঠানে পাক্ হতেছে, সেখানে বিবি সাহেবা আছেন।—অপেক্ষাকৃত চাপা স্বরে বলিল: পায়খানার কাছে বেড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখতে পাবেন।

ফকীর সাহেব একটা দা' লইয়া ধীরে ধীরে সেদিকে চলিলেন—যেন কিছু কাটিতে যাইতেছেন।

বেড়ার ছিদ্র-পথে সুসজ্জিতা বেগম সাহেবাকে দেখিয়া তাহার মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—আনন্দাতিশয্যে মানুষের মুখ কত সুন্দর হয় তাহা দেখিবার জিনিষ।

ফুলীর মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন: তিনি কি আমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানেন? তাঁকে ত অন্য রকম বলা গিয়েছে।

ফুলীর মা হাত দেড়েক পরিমাণ মাথা হেলাইয়া বলিল: তা আর জানে না? মেয়েলোক বাবা, পিঁপড়ার পেট-কামড়ী এবং চিনাজোঁকের হাসি বোঝে, আর একটা ঘরের মানুষের পেটের কথা—

ফকীর সাহেব উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন: শোকর্ আল্‌হামদুলিল্লাহ্—

সকালে মোল্লারা আসিল। ফকীর সাহেব তাঁহাদিগকে আট আনা পয়সা দিলেন, হজরত বায়জীদ বোস্তামীর মাজারে বাতি এবং সম্মুখস্থ পুকুরের গজাল মাছ ও

বড় বড় কচ্ছপগুলিকে কলা ও মুড়ী কিনিয়া খাওয়াইবার জন্য।

সকালেই তাহারা রওয়ানা হইয়া গেল এবং প্রায় বেলা আটটা পর্য্যন্ত হাঁটিয়া তিনমুখো রাস্তায় আসিয়া পৌছিল। বটগাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করিতে সকলে বসিয়া পড়িল।

হামদু মিঞাজি বলিল: চল দোকানেই বসি না।

কথাটা কাহারও মনে অযৌক্তিক ঠেকিল না—হুকার মাথার কল্কি হইতে ধূম ত নির্গত হইতেছেই।

সফিউল্লা বলিল: চা না খেলে সে এতগুলি লোককে তামাক দিবে কেন্?—তখন তুই চারিজন এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল: ক্ষিধে ত পেয়েছে বেজায়।

হিসাব করিয়া দেখা গেল আট আনায় হয়। সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তারপর চা, পান, তামাক ও বিড়ির সাথে সাথে গল্প শুরু হইল এবং তাহা বেলা এগারটার এদিকে আর থামিলও না।

তখন গরীবুল্লা মিঞাজী বলিল: চল—

সকলে প্রায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল: কোথায়?

—'ফেরৎ, আর কোথায়?' সকলের নাসারন্ধ্র দিয়া

আরামের নিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল—বুকটাও একটু হালকা বোধ হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

আবদুল জব্বার মোল্লাজী বিড়িতে শেষ দম্‌টী খেঁচিয়া লইয়া বলিল: কেন ফেরং যাবনা, পয়সা যা দিবে তা ত জানাই আছে, যতদূর আস্‌ছি ততদূরের ওজনও দিবে না। বড় লোকেরা খয়রাতের বেলায যে মুচী!

জোহরের পর তাহারা সহরের অন্যান্য দরগায় জেয়ারৎ করিয়া আসিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া 'দাউতে মক্‌বুল্‌' পড়িতে বসিল—সম্মুখে একথালা বিচি লইয়া সব গোল হইয়া ঘিরিয়া বসিল। মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল। হাত হইতে অনর্গল বিচি পড়িতে লাগিল। সেকেণ্ডে কত শব্দ পড়িতে পারা যায় হিসাব করিয়া দেখি নাই কিন্তু শতাধিক বিচি মুঠে মুঠে পড়িতে লাগিল।

রাত্রে খাওয়ার পর মৌলুদ,—মৌলানা জুলফিকর আলী সাহেব বিছানার পশ্চিম প্রান্তে বিরাট তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার আশে-পাশে মোল্লাগণ। তারপর সুদীর্ঘ বিছানা ব্যাপিয়া ছেলে বুড়া স্থানীয় লোক বসিয়া পড়িয়াছে।

উঠানের এক প্রান্তে বড় 'ডেকে' শির্নী পাকানো হইতেছে—অধিকাংশের দৃষ্টি সেই দিকে।

মৌলবী সাহেব এল্‌হান্‌ করিয়া প্রথমে কোরান শরীফের একটী আয়েৎ পড়িলেন, তারপর উর্দ্দু তর্‌জমায় শ্রোতৃবর্গকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তারপর নমরুদ ফেরাউন শাদ্দাদের বেহেস্ত, হারুৎ মারুৎ কারুণ ইত্যাদি হইতে বেহেস্তের হুর-পরিদের সৌন্দর্য্য, দোজখের আগুণের সত্তর গুণ উত্তাপ, মায় স্থদ এবং দাড়ির ফজিলৎ পর্য্যন্ত উর্দ্দুতে বয়ান করিলেন। অধিকাংশ শ্রোতা ঘুমে ঢুলিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা কোন প্রকারে মৌলানা সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বোধ হয় বেহেস্তের আর বেশী দেরী নাই এ ভরসায় জোরে ঘুমকে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন—যুবকদের দৃষ্টি ডেকের দিকে নিবদ্ধ।

হঠাৎ কোণা হইতে তুর্কী টুপী মাথায় একটী ছেলে দাঁড়াইয়া বলিল! হুজুর, উর্দ্দু ত এখানে কেউ বুঝে না, বাংলায় বল্লে স্থবিধা হয়।

হুজুর ত কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখের উপর কথা! তারপর সেটাকে সারিয়া লইবার জন্য গর্জ্জিয়াই

বলিলেন : বস মিঞা, ওয়াজের মাঝে বেয়াদবী কর ?—তারপর ফকীর সাহেবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন : ছেলেটী ইংরেজী পড়ে, না ?

ফকীর সাহেব মাথা নাড়িয়া জানাইল : হাঁ।

—দেখুন ত কেমন ধরে ফেলেছি ! ঐ নচ্ছারগুলিকে দেখ্‌লেই চিনা যায়, দাড়ি নাই, সাম্‌নে এক হাত চুল, ইস্‌লামী আদব কায়দার বো নাই, মুরুব্বীর সাথে বেয়াদবী করবে। আরে মিঞা, তোমার বাপের সমান আমার বয়স, আর তুমি আস আমারে উপদেশ দিতে !

এ অভদ্রোচিত ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তরে রহিমের সমস্ত শরীর ঘিস্‌ঘিস্ করিতে লাগিল। তথাপি নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিল : হুজুর, উপদেশ নয়, এ ত সত্য কথাই বলছি।

—আরে মিঞা, সত্য কথা ! তুমি আমারে ইস্‌লামী জবান, যার এক এক লফ্‌জে দশ দশ নেকী—ছেড়ে কুফরী জবানে ওয়াজ কইতে কও ?

রহিম আর থাকিতে পারিল না, এক রকম রাগিয়াই বলিতে যাইতেছিল : 'আপনি বাড়ীতে—?' কথা শেষ হইতে পারিল না, মৌলানা সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন। আশে পাশের সবাই

রহিমকে জোর করিয়া চাপিয়া বসাইয়া দিল: হুজুরের বদ্-দোওয়া পড়িবে।

আবার ওয়াজ শুরু হইল—

কিছুক্ষণ পর রহিম আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, পার্শ্ববর্ত্তী সকলে তাহার কাপড়ের কোঁচা ধরিয়া টানিতে লাগিল। সে কিন্তু বসিল না, বলিল: হুজুর আমার একটী ছওয়াল, সেই কথা নয়, আমি একটী কথা বুঝ্তে পার্চ্ছি না—'

হুজুর চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন: 'আচ্ছা বল—।'

—'হুজুর, এ-ত মৌলুদ শরীফ—হজরতের বেলাদৎ অর্থাৎ তাঁর জন্মের স্মৃতি উৎসব, এতে তাঁর জীবনের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কিছু না ব'লে আপনি ত শুধু বেহেস্ত দোজখ এবং সুদ দাড়ি দিয়েই শেষ কর্ছেন,—

—'আবার তুমি উল্টা কথা শুরু করলা মিঞা, এ সব কি হজরতের কথা নয়? ইসলামের কথা নয়? হজরত এ সব না শিখালে আমরা কোথা থেকে জানতাম?'

অবান্তর কথা শুনিলে মানুষের রাগ না হইয়া পারে না—রহিমের রক্ত গরম হইয়া উঠিল: 'মৌলানা আপনি কিছু জানেন না—'

—কি, আমি কিছু জানি না?. মৌলানা ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন: আমি কিছু জানি না, ছওয়াল কর্ দেখি, বাপ্‌কা বেটা হলে—।

এই রকম অবস্থায় পড়িলে ছওয়াল না করিয়া আর উপায় থাকে না। রহিমের কথাও যেন এবার শ্রোতাদের মনে লাগিয়াছে, তাহারা এবার হৈ চৈ না করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

রহিম বলিল: 'আচ্ছা বলুন ত, হজরত কত সনে জন্মেছিলেন?'

—'কেন, কেন, এ এ,—চক্ষু তাঁহার কপালে উঠিল,—'এ সাত শত হিজরীতে।'

রহিম শুষ্ক হাসি হাসিল, কিন্তু তাহার চোখ দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল,—'হাঁ সাত শত! তার উপর হিজরীও—সালাম আলায়কুম জনাব!' এই বলিয়া সে গম্ গম্ করিয়া মজলিস্ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ফকীর সাহেব হাত নাড়িয়া বলিলেন: 'চলুন আপ্‌নি, ওই ছোঁড়াটা ইংরেজী পড়ে একেবারে গেছে—'

মৌলানা সাহেব এবার সা'দী এবং রুমীর বয়েৎ টানিয়াই শুরু করিলেন।

কতক্ষণ পর—তখন শীর্ণির ডেক্‌চী চুলার উপর হইতে নামান হইয়াছে, মৌলানা সাহেব ফকীর সাহেবের দিকে ফিরিয়া কহিলেন: 'আজ তবিয়েৎটা বিশেষ ভাল নয়, মোখ্‌তছর করিয়া দিই।' ফকীর সাহেব বলিলেন: 'আচ্ছা, আচ্ছা, হুজুরের যো-মর্জ্জি।'

মৌলানা সাহেব মোনাজাতের জন্য হাত তুলিতে যাইবেন এমন সময় ফকীর সাহেব মৌলানা সাহেবের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কিছু যেন বলিলেন—উভয়ের চোখ মুখ হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

চিকের অন্তরালে বেগম সাহেবা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—মৌলানা সাহেবের উর্দ্দু তক্‌দির্ কিছুই বুঝা যাইতেছিল না, শুধু ভক্তিকে সম্বল করিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায়। কিন্তু মোনাজাতের জন্য হাত তুলিতেই তিনি আবার সুস্থির হইয়া বসিলেন—সমস্ত হৃদয় তাঁহার উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভাবিলেন তাঁহার স্বামীর পারলৌকিক আত্মার মঙ্গল কামনা করা হইতেছে—তিনি একাগ্রচিত্তে অতিশয় ভক্তির সহিত এ প্রার্থনায় যোগ দিলেন। সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল আমীন! আমীন!

চৌচির

বেগম সাহেবা নিজের কামরায় আসিয়া দেখিলেন শিশু-ছেলেমেয়েরা বিছানায় পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহাদের দিকে চাহিয়া তাঁহার মন আবার উতলা হইয়া উঠিল; অতীতের সমস্ত সুখ-স্মৃতি আসিয়া যেন তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ট্রাঙ্ক খুলিলেন, সমস্ত কাপড় চোপড় নামাইয়া একেবারে তলা হইতে বহু দিনের বাঁধানো একখানি ছবি বাহির করিলেন। নব-বিবাহিত দম্পতীর ছবি—স্বামী তখন বেজায় সৌখিন ছিলেন, এক দিন সকলের অজ্ঞাতে তাঁহাকে বাগান-বাড়ীতে লইয়া গিয়া এক রকম জোর করিয়াই এ ছবি তোলা হইয়াছিল। সে সব স্মৃতি আজ ব্যথার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সমস্ত চিত্তকে হাতুড়ি পিটা করিতে লাগিল। তিনি উন্মনা হইয়া গেলেন, বহুক্ষণ এমনি ভাবেই কাটিল—হঠাৎ তাঁহার শিথিল বাহুস্খলিত হইয়া ছবিটী মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সে ঝন্ ঝন্ শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু সুপ্ত শিশু-পুত্রের মুখের উপর চোখ পড়িতেই তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি বিছানায় উঠিয়া দুই হাতে ছেলেকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন—আর চুম্বনের উপর চুম্বন দিয়া তাহার ঘুমন্ত চোখ মুখ ভরিয়া দিলেন। তারপর

শিশুর শিথিল গালখানি নিজের গালের উপর রাখিয়া তিনিও চোখ বুঁজিলেন।

মোল্লা সাহেবরা রাস্তায় উঠিয়াই দিয়াশলাই জ্বালাইয়া পয়সা গণিয়া দেখিল, মাত্র চার আনা করিয়া মিলিয়াছে। রোগীর মুখে হঠাৎ তিক্ত ঔষধ ঢালিয়া দিলে যেমন তাহার চেহারা হয় তাহাদের চেহারাও তেমনি হইয়া উঠিল। মৌলানা সাহেব বলিলেন: 'বেটা আমাকেও আট আনার বেশী দিত না। শেষে মোনাজাতের সময় যখন কাণে কাণে বলল্—বেগম সাহেবার সঙ্গে তার বিবাহ যাতে হয় দোওয়া করবার জন্য, তখন ব'লে ঠিক করে নিয়েছিলাম এক টাকা খয়রাৎ দিতে হবে—তাই ত এক টাকা, না হয় আট আনার বেশী কিছুই মিলত না।'

তখন গরীবুল্লা মিঞাজি সফিউল্লার কাণে কাণে বলিল: 'দেখ, বায়জীদ্ বোস্তাম না গিয়ে, ফিরে এসে আর চা খেয়ে কি বুদ্ধিমানের কাজ করেছি!' দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিল: জান হে, শুধু বাতাসে দাড়ি পাকে নি··· ।'

হামদু মিঞাজি বলিল: 'আচ্ছা, মানুষের আক্কেল কেমন দেখ্ত ভাই। বেটাদের হায়াতে মউতে আমরা না হলে হয়

না—কেউ মরুক অম্নি ডাক মোল্লা; কারও ছেলে হোক অম্নি ডাকা মোল্লা, অথচ পয়সা দেবার বেলা টৌ টৌ'—তারপর দুই হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলি নাড়িয়া তাহার বাস্তব চিত্রও দেখাইয়া দিল।

—'আর বাঙাল চাষারা দিন্‌মজুরী করেও কমপক্ষে আট আনা পায়, দুত্তোর—'

আবদুল গলা সাফ করিয়া লইয়া বলিল: 'আমরা ইস্‌লামের জন্য কি না কর্‌ছি, পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ছি, রোজা রাখ্‌ছি, দাড়ি রাখ্‌ছি, লম্বা কোর্ত্তা পর্‌ছি, কোনদিন ধুতি তক্ পরি না—অথচ আমাদের এ হাল! আর তারা কোঁচা মেরে ধুতি পরে, দাড়ি চাঁচে 'নমাজ নেই, রোজা নেই, অথচ তাদের এক একটা ভুঁড়ি যেন এক একটা জাহাজের বয়া। এই ত খোদার বিচার!'

গরীবুল্লা: 'তৌবা-তৌবা নাউজুবিল্লা বল, পাক তিনি, তাঁর দোষ দিচ্ছ কেন কমবক্ত!'

পারিপার্শ্বিক ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া এমন অনেক কাজ করিতে হয় যাহা সর্ব্বান্তঃকরণে কখনও গ্রহণ করা যায় না।

চৌত্রিশ

নিজের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বেগম সাহেবাকে শেষকালে আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

শেষ বয়সের বিবাহ, দেরী করিবার কোন দরকার নাই; একদিন একটা মৌলবী ডাকিয়া পরিণয়-ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল।

ফকীর মোহাম্মদের পৈতৃক গ্রাম বাঁশবাড়িয়াতে তাহার প্রথমা স্ত্রী এবং তাহার গর্ভের দুইটী শিশু সন্তান আছে।

ফকীর সাহেব মধ্যে মধ্যে যায়, আসে।

এ বিবাহের পর হইতে তাহার পৈত্রিক বাড়ী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল—বাঁশের ঘরের জায়গায় মাটির ঘর, তারপর পাকা—।

জায়গা জমিও বাড়িতে লাগিল—পাড়ার লোকেরা দেখিয়া বলে: 'খোদা যিছ্‌কো দেতা হে ছপ্পর ফাড়্‌কে দেতা হে!'

পুত্র দুইটীকেও সহরে লইয়া আসিল—বেগম সাহেবা আদরের সঙ্গেই তাহাদিগকে নিজের স্নেহচ্ছায়াতলে আশ্রয় দিলেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব বাড়িয়া চলিল—ফকীর সাহেব ও বেগম সাহেবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের শরীর নব কিশলয়ের মত বিকশিত হইয়া উঠিতে

লাগিল। বেগম সাহেবার বড় মেয়েটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বয়সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার দিকে চাহিলে ফকীরের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, আবার নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হামিদের দিকে চাহিয়া তাহার নাক মুখ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। ভাবটা এই : "কি ছেলে হ'ল, মোটেই বাড়্ছে না'। বেগম সাহেবা কন্যার বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—চারিদিক হইতে প্রস্তাব আসে, কিন্তু ফকীর কোন না কোন ওজর দেখাইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেয়। কি মতলব কে জানে?

একদিন হঠাৎ বড় মেয়েটীর অসুখ হইয়া পড়িল—ফকীর সাহেব নিজেই ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিলেন।

বেগম সাহেবা ডাক্তার আনিতে বলিলে ফকীর যুক্তি-সঙ্গত কথাই বলিল : 'ডাক্তার এনে লাভ কি ?—ডাক্তারকে ত আর দেখান হবে না, অনর্থক পয়সা খরচ! আমি ডাক্তারকে বলে ঔষধ নিয়ে আস্ছি।' ঔষধ লইয়া আসা হইল, খাওয়ানোও হইল, পরদিন রোগিনী চিরতরেই রোগ এবং ঔষধ হইতে মুক্তি পাইল!

বৎসর শেষ হইতে না হইতেই মাত্র দুই একদিনের জ্বরে বেগম সাহেবার একমাত্র পুত্রটীও মারা গেল। ডাক্তার

ডাকিবার আগে ফকীর সাহেব একটী কি টোট্‌কা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে এমন ফল হইল ডাক্তার আর ডাকিতে হইল না। ফকীর সাহেব দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। আর অনাথিনী বেগম, তাঁহার কি চোখে পানি আছে যে কাঁদিবেন?—বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরদিনও তাঁহাকে ভূশয্যা হইতে উঠানো গেল না। ফকীর সাহেব কাঁদিয়াই বলিলেন: 'হায়াৎ মউৎ খোদার হাত—কি করা যায়?' বেগম সাহেবা নিহত—শাবক বাঘিনী যেমন করিয়া শিকারীর দিকে তাকায় তেমনি করিয়া একবার মাত্র তাকাইলেন—ভিতরের অত্যধিক উত্তেজনা সহ্য হইল না, পরক্ষণেই তিনি বেহুঁশ হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন।

বাহিরে কিছু বলিবার উপায় নাই—কিন্তু বাড়ীর এবং আশেপাশের সকলের মনে সন্দেহ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—এ সব স্বাভাবিক মৃত্যু নয়!

বেগম সাহেবা যেন নূতন করিয়া বিধবা হইলেন! স্বামীর সঙ্গে দেখাশোনা ছাড়িয়া দিলেন, নিজের কনিষ্ঠা কন্যা জাহানারাকে লইয়া তিনি আলাদা ঘরে বাস করিতে লাগিলেন।

সে কামরা হইতে বড় একটা বাহির হন না। জাহানারাকেও বাহির হইতে দেন না। অলঙ্কারপত্র, সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিলেন প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর যেমনটী ছিলেন ঠিক আবার তেমনটী হইয়া গেলেন।

কন্যা জাহানারার দিকে চাহিলে তাঁহার চোখ মুখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠে, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকেন। কোন প্রকারে দিন গুণিয়া গুণিয়া কাটাইতে পারিলেই যেন বাঁচেন।

দুর্ব্বিসহ শোকযন্ত্রণা, না পারিল সময়কে ধরিয়া রাখিতে, না পারিল জীবনের বাড়ন্তিকে ঠেকাইয়া রাখিতে।

দেখিতে দেখিতে জাহানারার বিবাহের বয়স আসিয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক হইতে ঘটকেরা হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল। কিন্তু ফকীর সাহেব এখন নয় বলিয়া তাহাদিগকে একে একে বিদায় করিয়া দিল। বেগম সাহেবা মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলেন—স্বামীকে কিছু বলিতে সাহস এবং প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। জাহানারার বয়স সতর আঠার হইতে চলিল, তথাপি তাহার বিবাহের কোন কথা নাই—ভিতরে ভিতরে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল!

চৌত্রিশ

বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া চলিল।

একদিন কথায় কথায় ফকীর সাহেব বাড়ীর বাজার-মুন্সীকে বলিল : 'হামীদের সঙ্গে জাহানারার বিয়ে হলে কেমন হয় ?'

বাজার-মুন্সী ত হা করিয়া রহিল। তাহার মুখে কোন উত্তর যোগাইল না। হামীদ ফকীর সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শেষকালে বাজার-মুন্সী আমতা আমতা করিয়া বলিল : সে ত জাহানারার তিন চার বৎসরের ছোট হবে।

'ও-তে কি মুন্‌সী সাহেব—আপনারা হাদীস পড়েন নি, তাই এমন কথা বলছেন। এ ত সুন্নত, আঁ-হজ্‌রত পঁচিশ বৎসর বয়সে বিয়ে করেছিলেন চল্লিশ বৎসরের বিবি খোদেজাকে।

মুন্‌সী সাহেবের মন যেন সুন্নতের দোহাই শুনিয়াও সায় দিতেছিল না—তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

কথা আর আগুন-চাপা থাকে না।

ধীরে ধীরে সব বেগম সাহেবার কাণে গেল। কিন্তু কন্যার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস এবং অশ্রু ছাড়া তাঁহার আর অন্য

সম্বল ছিল না। তাঁহার সারা দেহ মন কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলেন, না কিছুতেই হ'তে পারে না—আমি আমার মেয়ে দেব না! কিন্তু নিজের মৃত পুত্রকন্যার কথা মনে হইতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—যদি…। আর ভাবিতে পারিলেন না। না, আমি বাধা দেব না, মা আমার বাঁচিয়া থাক। সব অনর্থের গোড়া কোথায়, তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না—সম্পত্তি, সম্পত্তি, হায় স্বামী যদি সম্পত্তি রাখিয়া না যাইত তাহা হইলে আমার পুত্রকন্যারা বাঁচিয়া থাকিত, আমি ভিখারিণী হইয়াও রাজরাণীর মত সুখে থাকিতাম!

তাঁহার কাছে প্রস্তাব আসিতেই তিনি সম্মতি দিলেন: হামীদের সঙ্গে জাহানারার বিবাহ হউক।

ফকীর সাহেব বড় ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন শুরু করিল।

একদিন শুভদিনে এবং শুভক্ষণে কিনা জানি না, বাইশ বৎসরের জাহানারার আঠার বৎসরের হামিদের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। এই নবদম্পতিই আমাদের রওশনের জনক জননী। ইঁহাদের দাম্পত্য জীবনের কথা এ গল্পের বিষয়-ভুক্ত নহে।

হামীদ সাহেব তসলীমের সঙ্গে রওশনের বিবাহ হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। জাহানারা যখন রাগ করিয়াই বলিলেন, হইতে পারে এবং হইতে হইবেই, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন: দেখ এ রাগের কথা নয়, ইজ্জতের কথা, বংশের সম্মানের কথা। তস্‌লীমের বাপ আমাদের ষ্টেটে খাজানা দেয় তারা আমাদের প্রজা, কাজেই প্রজার সঙ্গে জমিদার-কন্যার বিবাহ হলে লোকের কাছে আর আমাদের মুখ দেখাবার পথ থাকে না। এ ত' গেল প্রথম কথা, তারপর হল এ রশীদের সঙ্গে রওশনের বিবাহ হলে মানাবে ভাল—'মেয়েটিও ঘরে রইল অথচ রশীদের বিয়ের জন্য টাকাও খরচ হল না। এ সব ত মেয়ে মানুষের বুদ্ধিতে আসে না!' বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া তিনি বাহিরের কাজে চলিয়া গেলেন।

গৃহিণীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাহার এতদিনের সাধ, বহুদিনের বাসনা সব কি আকাশকুসুমে পরিণত হইবে? রশীদ তাহার দেবর-পুত্র—শিক্ষা-দীক্ষা টৌ টৌ। গত বৎসর রেঙ্গুনে পলাইয়া তাঁহারই পৈতৃক সম্পত্তির হাজার খানি টাকা নষ্ট করিয়া আসিয়াছে। এ চরিত্রহীন অকর্ম্মণ্য যুবকের সঙ্গে রওশনের বিবাহ, অসম্ভব। এ ঘরে বিবাহিত হইয়া তাঁহারা মাতা-কন্যায় যে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহাত স্মৃতিফলক হইতে আজিও মুছিয়া যায় নাই। তিনি মা হইয়া কোন্ প্রাণে তাঁহার স্নেহের পুত্তলি কন্যা-রত্নকে সে অত্যাচার লাঞ্ছনার উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন? তিনি মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইলেও তিনি রশীদের সঙ্গে রওশনের বিবাহ দিবেন না।

হামীদ সাহেব বারবার স্ত্রীর কাছে এ বিবাহের কথা উঠাইয়া তাহার মত লইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু জাহানারা স্পষ্টভাবে 'না' করিয়া দিলেন।

হামীদ সাহেব স্ত্রীর কাছে হারিবেন, এত বড় অপমান! মরদ হইয়া আওরতের কাছে পরাজয়—না, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন তিনি এ বিবাহ দিবেনই :

চৌত্রিশ

নারী শুধু কুসুমকোমলা নয়, সময়ে লৌহকঠিনও বটে।

বেগম সাহেবার রাগও চরমে উঠিল—তিনিও স্পষ্টকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন। তাঁহারই পৈতৃক সম্পত্তিতে দেহপুষ্ট করিয়া তাহারই পৈতৃক ভিটায় দাঁড়াইয়া তাহার উপর জোর খাটাইবার কাহারও অধিকার নাই—তাহার নিজের কন্যা, তাহারই টাকায় লালিত পালিত—আজ বিবাহের সময় তিনি কাহাকেও পিতৃত্বের ক্ষমতায় কর্ত্তৃত্ব খাটাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে দিবেন না। তিনি তসলীমের সাথে রওশনের বিবাহ দিবেনই।

হামিদ সাহেবও গর্জ্জিয়া উঠিলেন: 'দেখে নেব, শরীয়েৎ আমাকেই অলি করেছে, আমার এজেন্ ছাড়া তার বিয়ে হতে পারে না।'

বেগম সাহেবাও ঝাড়িয়া বলিলেন: 'না হয় না হউক, বছর ছ'মাস পরে মেয়ে ত সাবালেগ্ হবেই, তখন কাহারও এজেনের দরকার হবে না, তার সম্মতিতেই বিয়ে হবে।'

—'ছি, ছি, তুমি এত কেলেঙ্কারী করবে!'

—'কিসের কেলেঙ্কারী। তুমিই ত করছ—যখন বয়স ছিল তোমাদের সব অত্যাচার সহ্য করেছি, মা আমার—,অশ্রু

আসিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দাঁড়াইল; অকথিত বেদনা অশ্রুরূপেই গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—।

'—আচ্ছা,' বলিয়া স্বামী গড়গড় করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ফাল্গুণ মাস আসিতেই হামীদ সাহেব বিবাহের যোগার যন্ত্রে লাগিয়া গেলেন—বেগম সাহেবাকে পুনরায় কিছু জিজ্ঞাসা করা তিনি দরকার মনে করিলেন না।

বেগম সাহেবা স্বামীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন: 'দেখ, অনর্থক কেলেঙ্কারী করোনা; এর ফল ভাল হবে না।'

তিনি চোখ লাল করিয়াই বলিলেন: 'কিসের ফল?'

—'রওশনের সঙ্গে রশীদের বিয়ে হ'তে পারে না।'

'—বিয়ের কথা বুঝা আওরতের কাজ নয়। আমি বল্‌ছি পারে এবং কেমন করে পারে তাও আমি দেখাচ্ছি,—' জোরের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া কথা কয়টি বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময় উঠানের মাঝে দাঁড়াইয়া আবার বলিলেন: 'বাঁদরকে নাঁই দিলে মাথায় চড়তে চায়!'

বাহিরে বিবাহের আয়োজন জোরে চলিতে লাগিল। বেগম

সাহেবাও আর নিজকে সামলাইতে পারিলেন না। ছেলেরা এখন ছোট। তিনি জামাইদের ডাকিয়া আনাইয়া:সব বিস্তারিত ভাবে জানাইলেন। শ্বাশুড়ীর নিপীড়িত জীবনের কথা জামাইদের অজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ব্যাপারে তাহারা কি বলিতে পারে। ছোট জামাই ত নূতন জামাই, কাছেও আসে না—পর্ব্ব উৎসবে দুই এক দিনের জন্য বেড়াইয়া যায় মাত্র।

বড় জামাই এখন শ্বাশুড়ীর আদেশ ঠেলিতে পারিল না। যাহাই হউক, ঠিক হইল, হামীদ সাহেব বাধ্য হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে ষ্টেটের ম্যানেজারী হইতে বরখাস্ত করিয়া বেগম সাহেবা নিজেই জমিদারী শাসন করিবেন।

হামীদ সাহেব শুনিয়াই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন; এত দূর, দেখি তবে। এবং এই লইয়া সকলকে খুব গালাগালি করিয়া তিনি এ বাড়ীর সব তাল্লুক ছাড়িয়া দিয়া বাঁশবাড়িয়া গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাড়ীতে যাইয়া, বাস করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন দুঃখকষ্টে পড়িলে আপনি তাহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া নিতে আসিবে। এ অবসরে তিনিও নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, তাহার কাজ করিবেন।

চৌচিৰ

তস্‌লীম সব শুনিয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ মহাযুদ্ধের অভিনয় হইতেছে, তাহাতে সে খুব লজ্জিত। কিন্তু করিবার কিছুই নাই—রূঢ় প্রকৃতি উদ্ধত হামীদ সাহেবকে সে খুবই চিনিত। তাহার আজীবনের বাঞ্ছিতাকে এ নির্ম্মম আন্দোলনে হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে সে একেবারে মুষড়িয়া পড়িল। পাশ করিয়া আসিয়াছে সে, কিন্তু ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। বাড়ীতেই বসিয়া আছে। এ ঘটনা তাহার কানে আসার পর হইতে মিঞাবাড়ীতে যাওয়া এক রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছে—সময় সুযোগে বেগম সাহেবাকে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া আসে মাত্র, না হয় তিনি রাগ করেন।

গ্রাম শত কুসংস্কারে জর্জ্জরিত হইলেও নিজের জন্মভূমি—জন্মভূমির প্রতি প্রত্যেকের একটা কর্ত্তব্য আছে নিশ্চয়ই এ শিক্ষা, কি করিয়া জানি না, তসলীমের ছিল। তস্‌লীম দেখিল, নায়েবে রছুল মোল্লা মৌলবীর দল গ্রামে এক একটা নায়েবে-খোদা হইয়া বসিয়া আছে, তাহারাই ধর্ম্ম, তাহারাই শরীয়েৎ। একদিন শুক্রবার, জুম্‌আ পড়িতে যাইয়া দেখে

চৌচির

মসজিদে হুলুস্থুল ব্যাপার, এক্ষণি সালিস হইবে ; তাহারা কেউ কলিমউদ্দীনকে লইয়া নমাজ পড়িবে না। সে হট্টগোলের মধ্যে বহু সাধ্য সাধনায় ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল—কয়েক দিন হইতে কলিমদ্দীনের স্ত্রী প্রসব-বেদনায় ভুগিতেছিল, গ্রাম্য ধাই-রা তাহাদের বিদ্যা শেষ করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কিছুতেই প্রসব করাইতে পারে নাই। মরণোন্মুখ স্ত্রীর দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কলিমউদ্দীন পুরুষ ডাক্তার আনিয়া তাহার প্রসব করাইয়াছে—এই তাহার অপরাধ! স্থির হইল তাহারা কলিম উদ্দীনের সঙ্গে নামাজ পড়িবে না—বা'দ জুম্‌আ তাহার কী শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহার সালিস হইবে। কলিমউদ্দীনকে মসজিদের বাহির করিয়া দেওয়া হইল। মরণোন্মুখ স্ত্রী-পুত্রকে ফিরিয়ে-পাওয়া-ভক্তের কৃতজ্ঞতায় ভরপুর চিত্ত মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ফরিয়াদ করিয়া ফিরিয়া গেল। ভক্তবৎসল দয়ার সাগর কী সে চারি দেওয়ালের ভিতর বাঁধা ছিলেন?

তস্‌লীম অবাক হইয়া গেল—এ কী কাণ্ড! তাহার পিতাও একজন মাতব্বর, অবস্থার গতিক না বুঝিয়া হঠাৎ

পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও সাহস হইলনা। জুম্‌আর শেষে শালিস বসিল—বিচারে ঠিক হইল এমন কুফরী কাজ যে করিতে পারে তাহার সঙ্গে কারও সম্বন্ধ রাখা হইবে না, তাহাকে একঘ'রে করিতে হইবে। শরিয়তের কাজে মতান্তর করিতে নাই, সকলে একমত হইল।

তস্‌লীমের আর সহ্য হইল না সে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল: দেখুন, এতে কলিমউদ্দীনের এমন কী অপরাধ হয়েছে বলুন ত। চার পাঁচ দিনের প্রসব-যন্ত্রণায় স্ত্রী মরে যাচ্ছে, গ্রামে লেডী ডাক্তার নেই, এমন অবস্থায় সে বেচারা করে কী? স্ত্রী পুত্রকে বাঁচান কী ফরজ্‌ নয়? ধরে নিলাম পুরুষ ডাক্তার দিয়ে প্রসব করাতে তার পাপ হয়েছে—কিন্তু ঐ পাপের চাইতে প্রসূতি এবং তার ছেলের জীবনের মূল্য কী অনেক বেশী নয়?

'নাউজুবিল্লাহ্‌,—সকলের মুখ হইতে এক রকম ফাটিয়াই পড়িল। তস্‌লীমের বাপ গর্জ্জিয়া উঠিলেন: বস্‌ তুই, ইংরেজী পড়ে বড় কাবেল হয়ে গেছিস।

মৌলবী সা'ব বলিলেন,—দেখুন তস্‌লীম মিঞা, ধর্ম্ম হয়েছে গোখ্‌রো সাপ, ঐ নিয়ে খেলা কর্‌বেন না—নিজের ত শরীয়েৎ পালন করেন না, না দাড়ি আছে, না সুন্নৎ

মোতাবেক লেবাছ আছে আপনাদের, অথচ মানুষকে শরীয়-তের বরখেলাপ কাজে উৎসাহ দিচ্ছেন। শুনুন তবে বলি, এই যে জীবনের মূল্যের কথা বল্‌ছেন,—জীবন কয়দিনের? সামান্য কয়েকটা নিশ্বাসের সমষ্টি ত, আজ আছে কাল নাই। আর শরীয়েৎ পালন করে মরে বেহেস্তে যাওয়া কী শরীয়তের খেলাপ কাজ পাপ করে বেঁচে থেকে জীবনের মূল্য বাড়াবার চাইতে হাজারো লাখো গুণে ভাল নয়?—ডান দিকে ফিরিয়া বলিলেনঃ দেখুন নুরীর বাপ, আগের জমানায় আলেমরা ইংরাজী পড়তে নিষেধ করেছিলেন, তা কী সাধে? নুরীর বাপ মাথা নাড়িয়া জানাইলঃ সাধে মোটেও নয়।

তস্‌লীম দেখিয়া শুনিয়া বুঝিল, শিক্ষা ছাড়া ইহাদের জন্য অন্য কোন উপায় নাই। ভাবের ঘরে মুক্তি না আসিলে বাহিরের বন্ধন ঘুচিবে না। সেখানে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না জাগিলে বাহিরে ভাঙ্গন অসম্ভব।

প্রতিবাদ করিয়া কাজ হয় না। সে ধীরে ধীরে গ্রামবাসী-দের সঙ্গে মিল্ দিতে লাগিল। তাহাদিগকে শিক্ষার উপকারিতা, মুর্খতার পরিণাম বুঝাইতে লাগিল—ছোয়াবের লোভ, চাকরীর লালসাও দেখাইতে হইল। মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া

আর কিছু কিছু চাঁদা উঠাইয়া মসজিদের পার্শ্বে একটা প্রাইমারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিল। কর্ত্তাদের সঙ্গে লেখালেখি করিয়া কিছু সরকারী সাহায্যেরও ব্যবস্থা হইল।

দিন সুখেই কাটিতেছিল তবে মধ্যে মধ্যে শহরের সংবাদ শুনিয়া তসলীমের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তবে নিজকে কাজের ভিতর ডুবাইয়া রাখিয়া সে সব চিন্তা যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইবাব প্রয়াস পাইত।

গ্রামে পানীয় জলের পুকুর নাই—একই পুকুরে স্নান হইতে কাপড় কাচা, ময়লা ধোওয়া, গরু ছাগলের গা ধোওয়া সব হইতেছে। গ্রামে সংক্রামক রোগ হইবে না কেন? সে সকলকে জুম্‌আর দিন পরিষ্কার পানির উপকারিতা বুঝাইয়া দিল; আর গ্রামের দুই মাথায় দুইটা পুকুর শুধু পানীয় জলের জন্য আলাদা করিয়া রাখিবার জন্য উপদেশ ও ব্যবস্থা করিয়া দিল। প্রতি শুক্রবারেই জুম্‌আর পর সে গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য, গ্রামের সংস্কারের জন্য কিছু কিছু বক্তৃতা দিত।

প্রতি শুক্রবারে মসজিদে খোৎবা পড়া হয়—আরবিতেই পড়া হয়, কাজেই কাহারও বুঝিবার যো নাই মোল্লা সাহেব পড়িয়া যাইতেছেন, আর মুসল্লীদের কেউ হা করিয়া আছে,

কেউ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছে, কাহারও ঘন ঘন হাই উঠিতেছে। ধর্ম্মবিধানের প্রতি এসব অজ্ঞতার অবিচার দেখিয়া তস্‌লীমের সত্যই দুঃখ হইল। একদিন বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলিয়া ফেলিল 'দেখুন: খোৎবার অর্থ বক্তৃতা, তার উদ্দেশ্য মানুষকে উপদেশ দেওয়া—তার ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি অর্থাৎ তার সব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করা। কাজেই সেই আলোচনা যাতে লোকের বোধগম্য হয় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিৎ—আরবদের মাতৃভাষা আরবী, তারা সেটা ভাল করেই বুঝে, তাই হজরত সে দেশে খোৎবা পড়তেন আরবীতে। সেজন্য যে দেশের ভাষা আরবী নয়, যারা আরবীর আ-ও বুঝে না তাদেরকেও আরবীতে পড়তে হবে তার কোন কথা নেই। কথা একটা না বুঝলে তার কি কোন তাছীর হয়?

ইমাম সাহেব বলিয়া উঠিলেন: 'এ যে সুন্নত।'

'আরে সা'ব, সুন্নত সবই! হজরত বাড়ীতে আরবীতে কথা বলতেন, আপনিও কেন বাড়ীতে আরবীতে কথা বলে সুন্নৎ পালন করেন না।'

মৌলবী সাহেব ত লা-জওয়াব। প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও

তিনি ভিতরে ভিতরে তস্‌লীমের উপর চটিয়া রহিলেন।—সব তাঁর ভাত মারার কথা! খোৎবার যদি বাংলা মানে করতে হয় তবে তাঁর চাকরীর আশাই যে ত্যাগ করিতে হয়। সেই হইতে তিনি তলে তলে তস্‌লীমের বদ্‌নাম করিয়া বেড়া-ইতে লাগিলেন। দুঃখ, সুযোগ জুটিয়া উঠে না ছোকরাকে জব্দ করিবার।

কয়েক সপ্তাহ পর এক জুম্‌আতে তস্‌লীম সুদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিল—তাহার বক্তৃতার যে অংশটুকুর উপর ভর দিয়া তাহার উপর কুফরী ফৎওয়া জারী করা হইয়াছিল তাহা এই—'দেখুন শরীয়েৎ সুদ দেওয়া নেওয়া হারাম করেছে—অথচ আমরা মুসলমানেরা সুদ না দিয়ে পারছি না, অবস্থা আমাদের বাধ্য করছে, এতে আমরা দিন দিন দেউলিয়া হচ্ছি, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। একটা ভরা কলস থেকে যদি ক্রমাগত শুধু জল ঢালতেই থাকে তবে সেটা শীঘ্র শূন্য হয়ে যায়; আর যদি জল ঢালাও হয় এবং ভরাও হয় তা হলে সেটা শূন্য হতে পারে না। আমাদের মৌলবী সা'বরা মুসল মানকে শুধু সুদ খেতে নিষেধ করছেন, সুদ দিতে বারণ করছেন না, অথবা এ রকম কোন উপায় বাতলাচ্ছেন না

'যাতে মুসলমান সুদের লেন-দেন না করে পারে—যে সুদ খাচ্ছে তার বাড়ীতে তারা ভাত খাচ্ছেন না—যারা সুদ দিতে দিতে উজার হয়ে যাচ্ছে তার বাড়ীতে খেয়ে তাকে আরও শূন্য করে দিচ্ছেন। আমরা যে জমানায় এবং যে দেশে বাস করছি সুদের লেন-দেন না করে আমাদের উপায় নেই। আজকালকার যত বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন তাদের ব্যবসা করতে হয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে—এবং এসব ব্যবসা চলছে ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় অথচ ব্যাঙ্কের গোড়াই হল সুদ। কাজেই বলছিলাম, এ হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে, উন্নতি করতে হলে সুদ দিতে এবং নিতে হবে—ইত্যাদি। মৌলবী সাহেব খোদার শোকর করিলেন—খোদা এতদিনে তাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। মসজিদে বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া তিনি সেইদিন রাতারাতি ফখ্‌রুল্‌হেন্দ মৌলানা জমীরউদ্দীন সাহেবের কাছে যাইয়া দুই টাকা দিয়া ফৎওয়া লেখাইয়া আনিলেন—তস্‌লীম কাফের হইয়া গিয়াছে। দেশের সমস্ত মৌলবী মৌলনাদের দস্তখত নেওয়া হইল—কোরাণ হাদীসের খেলাপ কথায় কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার নাই। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া

পড়িল—তস্‌লীম কাফের হইয়া গিয়াছে। তস্‌লীমকে যাহারা প্রকৃত ভালবাসিত তাহারা সহানুভূতি করিয়া বলিল: 'আহা, কপাল ভাল, ছেলেটী বিয়ে করে নাই। বিয়ে করলে বিবিও তালাক হ'ত।'

কথায় আছে ঢোলের আওয়াজ কাপড়ের ভিতর চাপা থাকে না। হামীদ সাহেব শুনিয়াই ব্যাঙ্গ করিয়া বেগম সাহেবাকে লিখিয়া জানাইলেন: এখনও কি সাধ হয়? মেয়েটিকেও কাফের করতে পার কি না চেষ্টা করে দেখিও—তাহা হইলে তোমার জন্যে বেহেস্ত্ খাস করা হইবে। আমার মুখের কথা নয়—কুড়িজন বড় বড় মৌলবীর দস্তখৎ আছে। গরীবের কথা বাসি হলেই ফলে—ইত্যাদি। বেগম সাহেবাও উত্তরে জানাইয়া দিলেন—সেজন্য তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—আমি চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও করব' যারা তস্‌লীমকে কাফের বলে ফৎওয়া দিয়েছে, তস্‌লীম তাদের চেয়ে ঢের বড় মুসলমান।

তস্‌লীম দেখিল, ইহাদের সঙ্গে তর্ক করা আর হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা একই কথা। আর তর্ক যদি করেই তাহা শীঘ্রই মুখ

হইতে হাতে আসিয়া পৌঁছছিবে। দেখা যাউক কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়ায়—এই ভাবিয়া সে কিছুদিনের জন্য শহরে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল।

দিন পনর পরে তস্‌লীম শহর হইতে ফিরিয়া আসিল। সারাদিন তাহার পিতা তাহার একটী বার কুশল জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করিলেন না। তস্‌লীম দেখিল, তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া আছেন—মনে করিল তাহার প্রতি মৌলবীদের ফৎওয়ার জন্য এবং তাহার শরিয়ৎ-বিরুদ্ধ চলাফেরার জন্যই পিতার এ মনোকষ্ট। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি হয়ত' বুঝিতে পারিবেন—এ ভাবিয়া তস্‌লীম সন্ধ্যার সময় তাঁহার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। পিতা বিনাভূমিকায় গম্ভীর এবং দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন: তুই মিঞা বাড়ীর অন্দরে থাকিস্ কেন্? পিতার এ বিসদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে ত শৈশবাবস্থা হইতে সে বাড়ীতে মানুষ হইয়াছে—তাহাকে ত কেহ এ-রকম প্রশ্ন করে নাই। শান্তভাবে উত্তর দিল—'বেগম-মা যে বাহিরে থাক্‌তে দেয় না।' পিতা গর্জ্জিয়া বলিলেন: তাই ত বল্‌ছি, মেয়ে দিবার নামে ছেলের এ সর্ব্বনাশ করা।

—বাবা, কী বল্‌ছেন আপ্‌নি ?

—'কী বল্‌ছি ! একেবারে ছোট্ট কিনা, নাক টিপ্‌লে দুধ গলে ! কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন : আমি বারণ করছি তুই আর ওখানে যাবি না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি —বেগম সাহেবা ভাল নয়।

তস্‌লীমের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল—পিতার ঘৃণিত কুৎসিত ইঙ্গিত তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তাহার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল—সে উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল : 'বাবা' !—আর বলিতে পারিল না, উন্মাদের মত দৌড়াইয়া সে স্থান ত্যাগ ক রয়া গেল।

তাহার সমস্ত রক্তে রক্তে কাঁদন ছুটিয়াছিল। মা আমার, মা আমার। অন্তরের অন্তস্থল ভেদিয়া প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল, মা আমার— ! নয় দশ বৎসর বয়স হইতে যিনি নিজের পরিপূর্ণ মাতৃত্ব দিয়া আমাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন—যাঁহার মধ্যে ভোগাতীত মাতৃত্বের পরিপূর্ণ কল্যাণী মূর্ত্তি দেখিয়া সে মা বলিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, তাঁহার প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত ! সন্তানকে কেন্দ্র করিয়া মায়ের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত দোষারূপ ! তাহার সমস্ত অন্তর-বাহির জ্বলিয়া উঠিল।

আবার, সে কুৎসিত ইঙ্গিতকারী তাহার পিতা, জন্মদাতা! রাগে ঘৃণায় এক একবার তাহার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল।

আবার পরক্ষণেই তাহার চোখমুখ ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিল! তাহার শিরায় শিরায় মানুষের আদিম প্রবৃত্তি কোলাহল করিয়া উঠিল: ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই! পিতা হউক, জন্মদাতা হউক, ক্ষমা নাই এ অপরাধের! সারারাত্র তাহার ঘুম হইল না—ভিতর বাহির দৌড়াদৌড়ি করিয়াই সেই রাত খতম করিয়া ফেলিল।

সকালে তস্‌লীম দেউড়ী ঘরের বারাণ্ডায় গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। পার্শ্বে বাড়ীর চাকরটা হাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকা টানিতেছে—হাসিয়া বলিল—তস্‌লিম মিঞা জানেন, আপনার শ্বশুড় এসেছিল'। শহরে তাহার বিবাহের কথা সকলে জানিত। সে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কবে?"

'এ আপনি ফিরবার কয়েকদিন আগে'।

'কী কয়ে গেল'?

'তা আমরা শুনিনি, বড় মিঞার সঙ্গে চুপি চুপি কইলে সব—

এত ঢং কেন বাবা, বিয়ের কথা কে যেন শুনেনি! সে একটু বাঁকা হাসি হাসিল।—

বিদ্যুৎস্পর্শের মত তস্‌লীম চমকিয়া উঠিল—এই অনর্থের গোড়া কোথায় বুঝিতে আর বাকী রহিল না। এত খানি নীচ যিনি তাহার মেয়েকে বিবাহ করিতে পারিব না—দেত্তর। তার দেহ মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল!

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সে বাহির হইয়া পড়িল—পিতার এত বড় কুৎসিত দোষারূপের পর এ বাড়ীতে থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব, কেমন করিয়া সে তাঁহাদিগকে মুখ দেখাইবে—বিশেষতঃ তাহার স্নেহময়ী জননীকে। রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় সে সেই রাত্রেই নিরুদ্দেশ বাহির হইয়া পড়িল।

কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়াও তাহার মন ঠাণ্ডা হইল না—জীবন যেন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিল। মনে পড়ে চির স্নেহময়ী বেগমমাতার কথা, আর কুসুম সদৃশ্যা ক্ষুদ্র বালিকা রওশনের ব্রীড়াশ্রীমণ্ডিত মুখচ্ছবি। আবার তাহার ভাবের গতি ফিরিয়া যায়—দোষ করিয়াছে হামিদ সাহেব অথবা তাহার পিতা কিন্তু তার প্রতিশোধের আঘাত ত সম্পূর্ণ যাইয়া লাগিবে বেগম সাহেবা এবং রওশনের বুকে। যাহাদের স্নেহ মমতায় সে লালিত-

পালিত ও বৰ্দ্ধিত, আজ অমূলক দোষারূপের জন্য নির্দ্দয়ভাবে সে শাস্তি দিতে যাইতেছে তাহাদিগকে। বেগম সাহেবা বা রওশান ত কোন অপরাধ করে নাই। আজ যদি সে তাঁহাদের দুর্দ্দিনের সুযোগ লইয়া এ বিবাহ না করে, তবে ঘরে বাহিরে বেগম সাহেবার মাথা হেঁট হইয়া যাইবে। হামীদ সাহেবও বিজয়গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিবে, আর বেগম সাহেবাকে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া তেতোবিরক্ত করিয়া তুলিবে। আর পিতার কুৎসিৎ ইঙ্গিত ত এমনি করিয়া চিরদিন মাথা উঁচু করিয়া থাকিয়া যাইবে। না, এ অমূলক সন্দহকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া বেগম সাহেবার অমল-ধবল আভিজাত্য-শ্রীমণ্ডিত মহান চরিত্রকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। সে সঙ্কল্প করিল পিতামাতার বিনা অনুমতি সত্বেও সে রওশনকে বিবাহ করিবে।

এ দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সে বেগম সাহেবার কাছে উপস্থিত হইল।

বেগম সাহেবার দূরদর্শিতা অসাধারণ। তিনি এ রকমভাবে বিবাহ হইতে পারেন না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তস্‌লীম ত অবাক, কেন?

'তোমার পিতা-মাতার উপস্থিতি—অন্ততঃপক্ষে তাদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে কেমন করে হতে পারে?

'তা হলে কী করা যায়, আমি জানি ওঁরা অনুমতি দিবেন না।'

'তোমরা ছেলে মানুষ, বুঝছ না—আজ যদি কাকেও না জানিয়ে বিয়ে হয়, দেখবে কাল, দেশময় ঢি ঢি পড়ে যাবে, এদেশের মেয়েদের সম্মান অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর কাল সবাই বলবে এমন কিছু অস্বাভাবিক কাজ নিশ্চয়ই ঘটেছিল, যার জন্যে ছেলের অভিভাবকদের না জানিয়ে বিয়ে দিতে হয়েছিল—তখন···?

তস্‌লীম দেখিল কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, এবং এ রকম একটা কুৎসিৎ আলোচনা লোকের মুখে মুখে জাহির হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সে জিজ্ঞাসা করিল—'তবে কী করা যায়।

'কিচ্ছু করতে হবে না, আমি জানি তুমি পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে, তোমাকে তাঁরা ছেড়ে দিতে পারেন না—আজ অনুমতি না দেন দু'দশ দিন পরে নিশ্চয়ই দিবেন। মুরুব্বিদের দোওয়া না নিয়ে এত বড় কাজ করা ভাল নয়। তুমি এক কাজ কর আমি খরচ দিচ্ছি, কলিকাতা যাও; এবার এম, এ-টা দিয়ে দাও—ইত্যবসরে ওঁদের রাগ ও ঠাণ্ডা হয়ে আসুক।'

চৌচির

কলিকাতা আসিয়া কিছুদিন পর সে পিতাকে এক সুদীর্ঘ পত্র দিয়া সব জানাইল। তাহার বিবাহ ব্যাপার, হামিদ সাহেবের প্রতিবন্ধকতা, বেগম সাহেবার সঙ্গে ঝগড়া ইত্যাদি হইতে হামীদ সাহেবের মিঞা বাড়ী ত্যাগ তারপর বেগম সাহেবাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার ঘৃণিত চেষ্টা—একটার পর একটা বর্ণনা করিয়া সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বুঝাইয়া বলিল—তার পর তাহার কঠিন ব্যবহারের জন্য এবং তাঁহাকে না বলিয়া কলিকাতা চলিয়া আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র উপসংহার করিল। পত্র পাঠ তস্‌লীমের পিতার সব কিছু দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গেল—তিনি নিজের অন্যায় সন্দেহ এবং পুত্রের প্রতি রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। তিনি বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি জানাইয়া পুত্রকে চিঠি লিখিলেন। ঠিক হইল এম, এ পরীক্ষার পর বিবাহ হইবে।

আগষ্টে তস্‌লীম পরীক্ষা দিয়া ফিরিয়া আসিল। আনন্দে তাহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে—আজীবনের আশা তাহার আজ ফলবতী হইবে। রওশন এখন গৃহের নিভৃততম স্থানে আশ্রয় লইয়াছে তস্‌লীমের চক্ষু আনাচে কানাচে ঘুরে কিন্তু তাহা প্রাচীরে শূন্যে ব্যর্থ আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে। রওশন

কেমনটী হইয়াছে একটিবার দেখিতে বড় সাধ। দিনে দিনে তাহার দেহ এখন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সারা দেহে যৌবন-ময়ুরী পেখম মেলিয়া ধরিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য-কল্পনায় তস্‌লীম তন্ময় হইয়া যায়।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।

কথায় কথায় একদিন মিঞা বাড়ীর বাজার-মুন্সি বলিয়া ফেলিল—

তস্‌লীম মিঞা, এবার বেগম সাহেবারা খুব বেড়িয়ে আস্‌লেন, আপনি যেতে পারলেন না, নাজিমপুর গেছলেন জমিদারী দেখতে, সেখান থেকে বাদামতলী তাহের মিঞাদের বাড়ীতে ও গেছলেন, সেখানে দুই দিন ছিলেন।'

'বেশ ত থাকলে আমিও যেতে পারতাম, খুব ফুর্ত্তি হত'। তার মুখ ঈষৎ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

'বেশ ত বল্‌ছেন—কিন্তু যে বদনামী হয়েছে তা আর কাণে শুনবার নয়'।

'কি বদনামী!' মুখ তার কালো হইয়া উঠিল।

'তা শুনবেন, আমি বল্‌তে পারবনা।'

চৌচির

তস্‌লীম আর কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

বেগম সাহেবার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিল, তাহা শুনার চাইতে বজ্রাঘাত হয় ত তাহার পক্ষে ঢের ভাল ছিল।

গত বৈশাখে বেগম সাহেবা মফস্বলে গিয়াছিলেন। বাড়ীতে দাসীবাঁদি ছাড়া মেয়েলোক বলিতে আর কেহ নাই, কাজেই রওশনকে ও সঙ্গে নেওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না। পশ্চিমপুর তাঁহার বড় জামাইর বাড়ী—সেখানে যাইয়া উঠিলেন। জামাইর মধ্যস্থতায় তিনি সেখানকার প্রজাদের হাল-অবস্থা দেখিতে লাগিলেন।

পশ্চিমপুর হইতে বাদামতলী মাত্র ক্রোশ দুইয়ের পথ। তস্‌লীমের কলিকাতা যাওয়ার পর হইতে বেগম সাহেবাদের বাড়ীতে বাদামতলী গ্রামের তাহেরউদ্দীন নামক একটী ছেলে যায়গীর থাকে। সেও বেগম সাহেবাকে মা বলিয়া ডাকে—গ্রীষ্মের বন্ধে সে বাড়ী আসিয়াছিল, যখন লোকমুখে শুনিতে পাইল বেগম সাহেবা পশ্চিমপুর আসিয়াছেন, সে যাইয়া ধন্না দিয়া পড়িল তাহাদের বাড়ীতে একবার পদধূলী দিতেই হইবে। বেগম সাহেবা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, যাওয়া সম্ভব নয় এবং

উচিতও নয়। বাদামতলীর পাশাপাশিই বাঁশবাড়িয়া গ্রাম—তিনি বাদামতলী গেলেই স্বামী এবং শ্বশুরকুলের লোকেরা শুনিতে পাইবে, পাশাপাশি গ্রামে যাইয়া তাহাদের সেখানে না গেলে তাহারাও বা কী মনে করিবে, লোকেও বা কী বলিবে অথচ বর্ত্তমানে রওশনের বিবাহ ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সে বাড়ীতে যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সেখানে না যাইয়া তাহাদের বাড়ীতে গেলে নিতান্ত বেখাপ্পা ও বিশ্রী দেখায়। কিন্তু তাহের নাছোরবান্দা, এ সুযোগ হারাইলে তাহার জীবনে নাকি এ পদধূলির সৌভাগ্য আর হইবে না। সে বলিল, সে গোপনে লইয়া যাইবে, তাঁহার যাওয়া গোপন রাখিবে এবং পরদিন গোপনেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। একদিনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পথ কেবা আসে কেবা দেখে।

তাহার কাকুতি-মিনতিতে দয়ার্দ্র-হৃদয়া বেগম সাহেবার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি শেষকালে রাজী হইলেন।—

পরদিন চলিয়া আসার জন্য তিনি উদ্যোগ করিতেই তাহেরের মা ও বাড়ীর সবাই চাপিয়া ধরিলেন, না, বুবু আজকের দিনটা থাকিয়া যাইতে হইবে। এতগুলি লোকের অনুরোধ ঠেলা যায় না—আর একটা দিন বইত নয়।

এসব অপরিচিতাদের মাঝে পড়িয়া রওশনের যেন নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; সে অনবরত মাকে খোঁচাইতে লাগিল—চল।

'ছি, মা, এতগুলি লোকের কথা ঠেলে চলে গেলে কী বল্‌বে ওঁরা, একটা দিন ত মাত্র; তিনি তাহাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া কোন প্রকারে চুপ করাইলেন।

পরদিন সকালে বারাণ্ডায় বসিয়া বেগম সাহেবা তাহেরের মার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। হঠাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিয়া এক ভিখারিণী আসিয়া হাজির হইল। ভিখারিণী কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভিক্ষা না লইয়াই চলিয়া গেল—ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া তাহেরের মা অনুচ্চস্বরে ভিখারিণীর উদ্দেশ্যে ডাক দিল কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বেগম সাহেবাও আশ্চর্য্য হইলেন—কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার খেয়াল হইল এই রকম কোন মেয়ে যেন কিছুদিনের জন্যে তাঁহার বাড়ীতে চাকরাণী ছিল—হইতেও পারে, বাঁশবাড়িয়ার কত মেয়েইত তাঁহার এখানে কাজ করিয়া আসিয়াছে, এখনও ত দুই এক জন আছে।

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াই হয়ত ভিখারিণী চলিয়া গিয়াছে—

এখনই হয়ত সে তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে সংবাদ দিবে। নানান অনর্থের সম্ভাবনায় তাঁহার চোখমুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তখনই বিদায়ের ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বিদায়েরসঙ্গে সঙ্গে দেশময় ঢি ঢি পড়িয়া গেল। আত্মীয় অনাত্মীয় অনেকেই কষ্ট করিয়া তাহেরদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিল। শ্বশুরকুলের লোকেরা পশ্চিমপুর পর্য্যন্ত সন্ধান লইয়া গেল।

বাঁশবাড়িয়া, বাদামতলী প্রভৃতি গ্রামের ঘরে ঘরে আন্দোলন পড়িয়া গেল—। শ্বশুর বাড়ীতে ত মরার শোক—তাঁহারা লোকের সম্মুখে আর বাহির হইতে পারেন না। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে এত বড় অপমান তাঁহাদের পরিবারে নাকি আর হয় নাই—যাহাদের সঙ্গে তাহারা সম্বন্ধ করে না, একাসনে বসিয়া খায় না, তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহাদের বৌ ও মেয়ে দুই দিন থাকিয়া গেল! পাড়ার লোকদের কাছে লজ্জায় তাহাদের মাথা হেঁট হইবারই ত কথা!

শ্বশুর বাড়ীতে না উঠিয়া, তাহাদিগকে না জানাইয়া বেগানা বাড়ীতে যাইবার কারণ কি?

এত বড় একটি কাণ্ডের কোন সিদ্ধান্ত না করিলে পাড়া প্রতিবেশীদের পেটের ভাত হজম হয় না, বুড়াবুড়ীদেরও রাত্রে সুনিদ্রা আসে না—নানা জনে নানা কথা বলিল—

‘বেগম সাহেবার চরিত্র ভাল নয়—

‘বুড়ী মাগী তলে তলে এতও—

‘মা আর ছেলে না হলে কী এত অসঙ্কোচে পারে—, ইত্যাদি।

গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই—তাহারা বয়সের বাহিরের কথা বিশ্বাস করিবে কেন।

শেষকালে এ বিরাট আন্দোলনকে মন্থন করিয়া যে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হইল তাহা এই ঃ—

মেয়ের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাহেরের খাতির ছিল, পরে মেয়ে তাহেরের সঙ্গে বাহির হইয়া আসে। অনন্যোপায় হইয়া বেগম সাহেবা মেয়েকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইতে অথবা তাহাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। এই রকম যুক্তিসঙ্গত কথা বিশ্বাস না করিবার গ্রামবাসীদের কোন হেতু নাই।

আগাগোড়া শুনিয়া তস্‌লীম স্তম্ভিত হইয়া গেল—এও

কী সম্ভব? তাহার সমস্ত দেহের ভিতর বারুদ পুরিয়া কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল—ইচ্ছা হইতেছিল সমস্ত গ্রামশুদ্ধ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া এ নিদারুণ হিংস্রবৃত্তির প্রতিশোধ নেয়! কী অপরাধ করিয়াছিল এনিরপরাধ কুসুমকোমলা বালিকা। তাহাদের কী সুখের কণ্টক হইয়াছিল?

দুই দিনের জন্য একটী গৃহকোণ আশ্রয় লইয়াছিল—দুইদিন পরেই সে চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের সুখ-নিদ্রার কী ব্যাঘাত হইল?

তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল—চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া সেখানে জটলা পাকাইয়া তাহাকে নেশাখোরের মত করিয়া তুলিল। সারারাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না—কী যেন সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা আসিয়া তাহার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

সকালে বেগম সাহেবা তাহার বিকৃত চোখমুখ দেখিয়াই বুঝিলেন—তাহার ভিতর চিন্তার দ্বন্দ্ব চলিতেছে—

তিনি তস্‌লীমকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই এ সব বিশ্বাস করিস্?'

'না, মা—পশ্চিমে সূর্য্য উদয় বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু এ কেমন করে বিশ্বাস করি?' মুখের গাম্ভীর্য্য ও কালোপনা দূর করিয়া সে হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে হাসি অশ্রুর চাইতে ব্যথাপূর্ণ। বেগম সাহেবা তাহার মুখের দিকে আর তাকাইতে পারিলেন না—চিন্তাক্লিষ্ট-মুখে তিনিও অন্য ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

তস্‌লীম কিছুতেই চিন্তামুক্ত হইতে পারিল না। এক একবার মনে হইল রওশনকে ডাকিয়া সব জিজ্ঞাস করে—। কিন্তু রওশন কোথায়? তস্‌লীম এবার আসিয়া অবধি আর রওশনের দেখা পায় নাই। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল এ জঘন্য দুর্ণাম তাহার উপর কেমন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে একবার দেখিতে।

কিন্তু রওশন কি জানি কেন সেই হইতে মনমরা হইয়া গিয়াছে —সে এখন কাহারও সম্মুখে বড় একটা বাহির হয় না। সে ভিতরে ভিতরে জানিত এবং বুঝিত এ মিথ্যা দুর্ণামে মুষড়িয়া পড়া মানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া'—তথাপি কি জানি কেন এ ঘটনার পর হইতে কাহারও সম্মুখে পড়িলে তাহার চোখমুখ ম্লান হইয়া উঠিত। কাজেই এখন সে গৃহের নিভৃততম স্থানটি আশ্রয়

করিয়া আছে! যতক্ষণ সম্ভব বই পড়িয়া কাটায়—সময় সময় চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিয়া তাহাকে বিমনা করিয়া তোলে। মধ্যে মধ্যে দারুণ অভিমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে।

একটু পরিবর্ত্তনে মনের অবস্থা হয়ত কিছু ভাল হইতে পারে, এই ভাবিয়া তস্‌লীম কয়েক দিন পরে বাড়ী যাইতে চাহিল। বেগম সাহেবাও এ অবস্থায় তাহাকে আটকাইয়া রাখা সমীচীন মনে করিলেন না। মা-বাপ ও আত্মীয়দের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মন হয়ত একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে। ধীরে ধীরে এ সব চিন্তা হয়ত তলাইয়া যাইতেও পারে।

বাড়ী পৌঁছিয়া কিন্তু তাহার মনের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। শহরে ইচ্ছা করিলে বিভিন্ন দিকে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে সময় কাটান যাইত। কিন্তু বাড়ীতে একা নিঃসঙ্গ জীবন—চিন্তাই তাহার একমাত্র সাথী হইয়া পড়িল। মনের দুশ্চিন্তা বল্‌গাহারা অশ্বের মত দিগ্বিদিক ছুটিতে লাগিল। রওশন—আবাল্য যাহাকে আকাশের চাঁদের মত নিষ্কলঙ্ক জানিতাম—যাহার চরিত্র আমার কাছে শুভ্র পুষ্পের চাইতে ও নির্ম্মল, তাহার সম্বন্ধে এ অভিযোগ? এক বৎসর নয়, আজ প্রায় দশ বার বৎসর হইতেই ত তাহাকে জানি কোন দিন

আচার ব্যবহারে ইঙ্গিতে তাহার ত এ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নাই।—আজ এ সব কেমন করে বিশ্বাস করি? পরক্ষণে চিন্তা অন্যদিকে ফিরিয়া যায়—মানুষের ভুল হওয়া কী অসম্ভব? মহাগ্রন্থ কোরআনইত বলেছে মানুষ ভুলের অধীন। কত মহাপুরুষের জীবনে পদস্খলন হইয়াছে, হয়ত মুহূর্ত্তের ভুল, শয়তানের প্ররোচনায় তাহারও পদস্খলন হইতে পারে না কি? কিছু ব্যতিক্রম না হইলে এ অভিযোগের উৎপত্তি হইবে কেন? তাহাদের সঙ্গে ত আর গ্রামবাসীদের দুশ্মনী নাই! আবার মনে হইত, না, না, রওশন এ সবের অতীত। আবার কোথা হইতে ফুঁড়িয়া যেন বাহির হয়—মানুষ ত। এ-সব চিন্তা করিতে করিতে সে উন্মাদের মত বিছানা হইতে দুপুর রাতে লাফাইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আহার করিতে বসে, খাইতে খাইতে আবার অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া থাকে। মা এ হাল দেখিয়া অবাক হইয়া যান—তাড়না করিতেই সে আবার গফ্ গফ্ করিয়া খাইতে শুরু করিয়া দেয়। কয়গ্রাস খাইয়াই ঝটপট উঠিয়া যায়। মায়ের অনুরোধ উপরোধের দিকে তাহার মন যায় না—বেশী বাড়াবাড়ি করিলে ঝাঁজের সহিত উত্তর দেয়—'পেটে যায়গা নেই কোথায় খাব?'

বৃদ্ধা জননী মনে মনে ভাবেন এ সব রোগের একমাত্র ঔষধ বৌ!

ভাই বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তস্‌লীমের বড় ভগ্নি তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছে। তস্‌লীম প্রথমে মনে করিল, যে গ্রামের লোকেরা তাহার চিরবাঞ্ছিত প্রেয়সীর নামে এত বড় মিথ্যা দুর্ণামের সৃষ্টি করিতে পারে, সে গ্রামে যাওয়া তাহার দ্বারা আর হইবে না। বলা বাহুল্য বাদামতলীতেই তস্‌লীমের বড় ভগ্নির বাড়ী। কয়েকদিন পরে আবার তাহার খেয়াল ফিরিয়া গেল—মনে হইল সেখানে গেলে হয়ত সব সংবাদের গোড়া পাওয়া যাইবে। কেমন করিয়া এ দুর্ণামের সৃষ্টি হইল কে বা কাহারা এর জন্য দায়ী। আর এসব কথার কতখানিই বা সত্য—গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপে অন্ততঃ এটুকুও আন্দাজ করা যাইবে। এই ভাবিয়া সে গেল।

যাইতেই চেনাপরিচিত সবাই তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল।—সকলের মুখে গোপন হাসি, চোখে বাঁকা চাহনী। এ দৃষ্টিজালের মধ্যে পড়িয়া তস্‌লীম মাথা তুলিতে পারিতেছিল না—কেন ইহারা আজ এত অসাধারণ ব্যস্ততার সঙ্গে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে

তাহা বুঝিতে তাহার বাকী নাই—কাজেই লজ্জা সরমে তাহার মাথা নুইয়া পড়িল।

ভগ্নিও ভগ্নিপতি ভূমিকা না করিয়াই বলিল শহরের বিয়ে কিছু-তেই হতে পারে না। তারপর একে একে সবিস্তারে কেমন করিয়া তাহাদের গ্রামের জলুর মা, রমজানীর মা ভিক্ষা করিতে যাইয়া যে-সব বিশ্রী কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আসিয়াছে—তাহাদের পাশের বাড়ীর হালীমনের দাদী ত নিজের চোখে মেয়েকে তাহে-রের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, বলিল। ভগ্নি নাস্তার বন্দোবস্ত করিতে কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়া গেলে ভগ্নিপতি তস্‌লীমের আরও কাছে ভিড়িয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত চাপাস্বরে বলিল—তাহের মিঞাদের পাশের বাড়ীর আজমোল্লা মিঞাজী নিজে আমাকে ডেকে বলেছে তার বৌ রাত্রে বেড়ার ছিদ্রপথে উঁকি মেরে দেখেছে সেই মেয়েকে তাহেরের সঙ্গে এক ঘরে, এমন কী এক মশারীতে—সে কসম করেই কথাগুলি বলেছে—মিঞাজী সাহেব পর-হেজগার দীনদার লোক—এসব মিথ্যা হলে অনর্থক কসম খেয়ে তাঁর এসব বলবার কী দরকার ছিল? তস্‌লীম আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না—ভিতরে তাহার বোমার মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেও সে নির্ব্বিকার ভাবে

বলিল—দেখুন কেউ যদি আমার সামনে কোরাণ মাথায় নিয়ে এসব কথা বলে অথবা স্বয়ং জিব্রাইল যদি আসমান থেকে নেবে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেন, তবুও ওসব আমার বিশ্বাস হবে না। বিনা কারণেই সকলের মুখ কাল হইয়া উঠিল।

তাহাদিগকে নাস্তায় বসাইয়া দিয়া ভগ্নি আবার কথাটী পাড়িলেন—এবার প্রথমে সৈয়দ বাড়ী হইতে চৌধুরী বাড়ী পর্য্যন্ত দেশের আরো বড় বড় বাড়ীর বহু সুপাত্রীর-লিষ্ট দাখিল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রূপেগুণে ইহাদের সমান শহরে কেন খোদার তামাম সৃষ্টির মধ্যে যে আর নাই, তাহা খুব জোরেসোরে বলিয়া শেষকালে বলিলেন—'সত্য যদি না হয় গ্রামবাসীদের কী স্বার্থ আছে যে তারা এসব মিথ্যা কথা বানিয়ে বলবে ?—আর দেখ, বদনাম যদি সত্য নাও হয় তথাপি যে মেয়ে সম্বন্ধে এত বড় বদ-নামী উঠেছে সে মেয়েকে কেমন করে বৌ করে আনা যায় ?

তস্‌লীম এবার জোর করিয়াই উত্তর দিল—সে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করবার জন্যই এ বিয়ে করতে হবে—অন্য কারণে এ বিয়ে বন্ধ হলে বিশেষ কিছু এসে যেত না কিন্তু এ মিথ্যা বদনামীকে আশ্রয় করে বিয়ে বন্ধ করা মানে সে মিথ্যাকে জিয়ে

রাখা, সে মেয়েটার জীবনকে ধ্বংস করা—কাজেই সে মেয়েটিকে বিয়ে করে সে মিথ্যাকে ধূলিসাৎ করতে হবে, সে নিরীহ মেয়েটিকে মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হবে। বেশ বক্তৃতার সুরে এই সব বলিয়া ফেলিয়াই তাহার যেন লজ্জা হইল—তাহার মুখকাণ লাল হইয়া উঠিল।

বাড়ীতে আসিয়া তস্‌লীমের চিন্তা আবার মাথার ভিতর নানা মূর্ত্তিতে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। ঘুম তাহার ছিল না—কোন প্রকারে একটু তন্দ্রার মত আসিতেই তাহার চিরবিরহী আত্মা কাঁদিয়া উঠিয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিত। নানা এলোমেলো চিন্তা আসিয়া তোষকশয্যাকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিত। এমনি রাত্রের পর রাত্র ভোর হইতে লাগিল—দিনের পর দিন সন্ধ্যা হইতে লাগিল। চিন্তা কিছুতেই শেষ হয় না—একবার এদিকে আর একবার ঐদিকে চিন্তা স্রোত ছুটে। তাহার প্রতি রক্ত বিন্দুতে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল সব মিথ্যা। কিন্তু আবার কখন মনে হয়, হইলেও ত হইতে পারে—মানুষের পক্ষে এ দুর্ব্বলতা কী অসম্ভব? নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় লোকের কাছে আমার যে স্বরূপ, সে কী প্রকৃত স্বরূপ? লোকে আমাকে ত নিষ্কলঙ্ক আদর্শ সাধু যুবক বলিয়াই

জানে—কিন্তু নিজের অন্তরের অন্তরতলে একথা বেশ করিয়াই জানি জীবনে ভুলও করিয়াছি, পদস্খলনও হইয়াছে—জানালায় সুন্দর মুখ দেখিয়া চোখ তুলিয়াও চাহিয়াছি, লোভ ও হয় নাই একথা বাহিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতে পারি কিন্তু নিজের অন্তরের জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি বলি তবে মিথ্যা কাপট্যের লজ্জার পীড়া হতে' মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ স্রোত ধরিয়া ভাবনা চলিতে লাগিল—আমার মত সবল পুরুষের, নানা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষায়, নানা চরিত্রের নরনারীর সংস্পর্শে যাহার চরিত্র গঠিত তাহার পদস্খলন যদি সম্ভব হয়, তবে স্বল্পশিক্ষিতা, জীবনে অনভিজ্ঞা, খাঁচায় চিরাবদ্ধা চরিত্রের স্খলন ত সহজেই সম্ভব। ঝড় ঝঞ্ঝায় বর্দ্ধিত গাছ যদি তুফানে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তবে আলোবাতাস হইতে বঞ্চিত ছায়ার আবেষ্টনে বর্দ্ধিত নরম গাছটি যে এক ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাতে বিচিত্র কি!—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিন্তা করিতে করিতে সে একেবারে উন্মাদের মত হইয়া পড়িল, শেষ কালে রওশনের উপর যাইয়া তাহার সমস্ত রাগ পড়িল—

আমার এত বৎসরের ভালবাসার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলে—আমার এতখানি স্নেহভালবাসা, এত বৎসরের পূজা পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলে—এত ভালবাসার ভড়ং করিবার

কি দরকার ছিল, নারী বিশ্বাসঘাতিনী! তাহার হাড়-মাংস শক্ত হইয়া উঠে—চোখ ফাটিয়া যেন আগুণ পড়িতে চায়।

দেশের আলো-বাতাস পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। বহু ভাবনা চিন্তায়ও তাহার মনের আগুণ নিভিল না—এ সন্দেহদ্বন্দ্বের কোন কুলকিনারা হইল না। শেষে তেতোবিরক্ত হইয়া সে ঠিক করিল দেশত্যাগী হইবে। কয়েক বৎসর দেশবিদেশ ঘুরিয়া হয়ত শান্তি পাওয়া যাইতে পারে এই ভাবিয়া সপ্তাহ খানি-কের মধ্যে সত্য সত্যই সে একদিন খানকয়েক কাপড় বগলে দাবিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তস্‌লীম কলিকাতায় আসিয়া পৌহুছিল। পূরাতন বন্ধুদের তালাসে এ মেস্ ও মেস্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—থিয়েটার বায়স্কোপ, কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের আগুণ নিভে না।

কলিকাতার নিত্য হট্টগোলের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আগুণ কতক্ষণ ছাই ছাপা থাকে?—

একদিন সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে সে কলেজ স্কোয়ারের এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিতেছে, সিগারেটে আগে তাহার অভ্যাস ছিল না কিন্তু এ যেন তাহার আগুণ দিয়া আগুণ চাপিবার চেষ্টা,

তাই সিগারেট এখন তাহার ঠোঁট ছাড়া হয় না। সিগারেটে খুব জোরে শেষ টান দিয়া চোখ তুলিতেই কে একটী ছোক্‌রা তাহার হাতের ভিতর এক নোটিশ গুঁজিয়া দিয়া গেল। কলি-কাতার চিরাচরিত ব্যাপার, রাস্তায় বাহির হইলেই ত এই রকম কত নোটিশ বিজ্ঞাপন কোথা হইতে আপনাপনি হাতের ভিতর গাদা হইয়া উঠে—হৈ, হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বিনামূল্যে হাজার টাকা পুরস্কার সেল্ সেল্ ইত্যাদি কিছু হইবে নিশ্চয়, ফেলিয়া দিতেছিল আবার কি জানি কেন লোভ হইল এক মিনিট সময় ও যদি কাটে তাহাও ত পরম লাভ!

দেখিল—সন্ধ্যায় বিরাট সভা, স্থান আলবার্ট হল, বক্তা স্থরেন বাড়ুর্য্যে, বিষয় বঙ্গবাহিনী। যখনকার কথা লিখিতে বসিয়াছি তখন পৃথিবীময় হুলস্থুল—ইউরোপের সব জাতি মিলিয়া মানুষ মারা বিস্তায় কার কত হাত যশ তাহার পরীক্ষায় লাগিয়া গিয়াছে। ইংরাজের ইজ্জত লইয়া টানাটানি পড়িতেই ইংরেজ মন্ত্রী ভারতবর্ষের বদান্যতার প্রতি আবেদন করিলেন। দেড়শত বৎসর পরে আবার বাঙ্গালীর অস্ত্র-গ্রহণের অনুমতি মিলিয়াছে—তাই নেতারা দেশের তরুণদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন 'তোমরা বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা কর।

যুদ্ধে যাউক বা না যাউক ·সুরেন বাড়ুর্য্যের বক্তৃতা, তাহাতে গেলে পৈত্রিক প্রাণ বিপন্ন হইবার কোন হেতু নাই এতটুকু সকল বাঙ্গালীই বুঝে, কাজেই সভাগৃহ একেবারে টইটম্বুর। চিন্তামুক্ত হইবার যে সুযোগটুক হাতের কাছে আসে তাহা হারাইয়া ঠকিতে তসলীমের ইচ্ছা নাই, ধীরে ধীরে সেও সেই জনসমুদ্রে যাইয়া ভিড়িয়া পড়িল।—

বক্তৃতার তুফান ছুটিয়াছে—বাঙ্গলার আদি ইতিহাস হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত কিছুই বাকী রহিল না। সে বক্তৃতায় মরাগাঙে বাণ ডাকিল—বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইল। অপূর্ব্ব শক্তিতে যখন বাঙ্গলার তদানিন্তন জন-নায়ক প্রশ্ন করিলেন—'কাপুরুষ বাঙ্গালী' এ বদনাম কী চিরদিন বাংলার ভালে থাকিবে? তখন দলে দলে বাঙ্গালী যুবক তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিল—।

বঙ্গবাহিনী গঠিত হইল।

তস্‌লীমের মন্‌ও তোলপাড় করিয়া উঠিল—জীবনটা ত বৃথাই নষ্ট করিলাম, দেশের, সমাজের, মানুষের কত কাজ করিব, কত উচ্চ আশা নিয়াই না জীবন আরম্ভ করিয়া ছিলাম, কিন্তু আজ এক কণা আগুণে সব পুড়িয়া ছাই

হইয়া গিয়াছে—। এ চিন্তার দাবদাহে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া জীবন রক্ষায় লাভ কী? ঘরে বাহিরে তাহার শান্তি ত কোথাও নাই। জন্মিয়াছে যখন, রোগে শোকে ভুগিয়া গৃহ কোণে, হয়ত বা রাস্তায় ঘাটে পড়িয়া অথবা দাতব্য চিকিৎসালয়ে বেতনভোগা সেবকদের অবজ্ঞার সম্মুখে শৃগাল কুকুরের মত একদিন ত মরিতে হইবেই—তার চাইতে'দেশের মুখ রক্ষায় জীবনটা উৎসর্গ করি না কেন? না, সেও যুদ্ধে যাইবে—। পরদিন সে বঙ্গবাহিনীতে নাম লিখাইয়া দিল।

কিছুদিন কুছ্ কাওয়াজের পর বধ্যভূমিতে যাত্রার পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজন হইতে শেষ বিদায় লইবার জন্য তাহাদিগকে পনর দিনের সময় দেওয়া হইল।

দেশে আসিয়া তাহার যুদ্ধযাত্রার সংবাদ দিতেই সকলে অবাক হইয়া গেল—এমন কাণ্ড ত তাহারা কখনো শুনে নাই। নিজের একমাত্র প্রাণটি নিজের হাতে করিয়া মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতে যায় এমন বেয়াকুপ দুনিয়ায় আছে এ তাহারা জীবনে ত দেখে নাই, কোনদিন তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের কাছে গল্প শুনিয়াছে বলিয়াও মনে পড়ে না। কাজেই দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল মৃত্যুপথ যাত্রিকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া পুণ্য

অর্জ্জনের। তস্‌লীমও, দেশবাসী এবং সকল আত্মীয়-স্বজন হইতে বিদায় লইতে লাগিল। তাহার পর ভগ্নি হইতে বিদায় লইবার জন্যে তাহাদের গ্রামে আসিতেই তাহার মনের পুরাতন ক্ষতে কে যেন হঠাৎ খোঁচা দিল—ছাই-চাপা আগুণ আবার অনুকূল বাতাসে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আবার চতুর্দ্দিক হইতে রওশনের চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। বিদায় বেলায় এ আগুণকে সাথী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে ত কর্ত্তব্য কাজের ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। সামরিক জীবনের কঠোর নিয়মবদ্ধ জীবন যাত্রায় প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য পালনে যদি ব্যথার আগুণ অবহেলা জন্মায় তাহা হইলে ত বড় লজ্জায় পড়িতে হইবে। এই সব সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল—ঘটনাটা একবার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিনা কেন? ঐবার ত শুধু বুবু আর তার স্বামীর কথা শুনিয়াই গিয়াছি।—

তারপর সকালে উঠিয়া, ভগ্নিপতিকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, কে বা কাহারা সে অপকর্ম্মের চাক্ষুস সাক্ষী;—তারপর একটা ছোক্‌রা দিয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া সবিস্তার জিজ্ঞাসা করিল।—জলুর মা বলিল, আমি না

আমার জা দেখিয়াছে, জা'কে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, সে দেখে নাই, দক্ষিণপাড়ার ফতুনীর মা তাহাকে বলিয়াছে। এই রকমে সব চাক্ষুস সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিল তাহা মোটামোটি এই দাঁড়াইল—তাহারা কেহ স্বচক্ষে কিছু দেখে নাই এমন কী মেয়েকেও না, তাহারা অমুক অমুকের কাছে শুনিয়াছে, এই অমুকের সূত্র ধরিয়া বহু তল্লাসেও শেষ অমুককে পাওয়া গেল না। তখন তস্‌লীমের বুঝিতে বাকী রহিল না সমস্ত ঘটনাটা এই রকম নির্জ্জলা সত্য—! একটা মিথ্যা সন্দেহের আগুণে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া, ছাই হইতেছে, আর একটী সুকুমার কুসুম দগ্ধিয়া মরিতেছে। সেই গ্রামবাসীদের প্রতি আবার তাহার নূতন করিয়া রাগ হইল—তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত রি রি করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সমস্ত গ্রামটিকে গলা টিপিয়া হত্যা করে।—

রাগ একটু পড়িতেই রওশনের অম্লান-মধুর মূর্ত্তি তাহার কল্পনায় ভাসিয়া লঠিল। পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। শৈশবকাল হইতে তাহাদের বিবাহের প্রতিবন্ধকতা পর্য্যন্ত একে একে সব কথা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল। এ মিথ্যা কাল্পনিক সন্দেহে বিশ্বাস করিয়া কী দারুণ

অন্যায়ই না সে করিয়াছে! দারুণ অনুশোচনায় তাহার মন আবার ধুঁকিয়া মরিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় মনে করিয়াছিল রওশনের সঙ্গে তাহার দেখা করা হইবে না, বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় শুধু বেগম সাহেবাকে সালাম জানাইয়া আসিবে। কিন্তু এখন তাহার অন্তরপুরুষ ফরিয়াদ করিয়া উঠিল—'না রওশনের সঙ্গে যে কোন প্রকারে দেখা করিতেই হইবে, তাহার পরিপূর্ণ ক্ষমা এবং অনুমতি লইয়া না গেলে তাহার যাত্রা শুভ হইবে না, তাহার জীবনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না।

বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া সে শহরে মিঞা বাড়ীতে আসিল। বেগম সাহেবা শুনিতেই তাঁহার চোখ মুখ বিষাদক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে সেই সন্দেহের আগুণই তাহাকে মৃত্যুপথের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, না হয় পরিবারের একমাত্র ছেলে, সে ভার গ্রহণ তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। তাঁহার নারী চিত্তে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বুঝিলেন তস্‌লীম তাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই। এতদিন শুধু মুখে মা ডাকিয়া অপমান করিয়াছে মাত্র। তিনি তখন বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু কুশল জিজ্ঞাসার পর

তাহার খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্তের জন্যে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

মায়ের এ অকারণ নিরুৎসাহ দেখিয়া তাহার মনও বিষাদিত হইয়া উঠিল। আজ তাহার সঙ্গে একটু ভাল করিয়া আলাপও করিলেন না, তাহার যুদ্ধ যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না—চিরাচরিত মেয়েদের বারণ করাটাও করিলেন না! তাহার মন চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। নানা এলোমেলো ভাব আসিয়া মনের ভিতর ঘুরিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল এখন হয়ত তাঁহার মন অন্যদিকে ফিরিয়া গিয়াছে, হয়ত বা রওশনের সঙ্গে বিয়ে না হওয়াতেই তাহার উপর হইতে তাঁহার মন উঠিয়া গিয়াছে। তবে কী শুধু তাঁর মেয়েটীর উদ্ধারের জন্যই আমায় স্নেহ করিতেন? সেই স্বার্থ কলুষিত স্নেহ লইয়া তিনি আমাকে পুত্র বলিতেন? ব্যথায় তাহার চোখ ফাটিয়া পানি আসিবার উপক্রম হইল। যাক্ তবে বিয়ে হয় নাই ভালই হয়েছে!

রাত্রে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিল—ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব-কল্পনা তাহাকে পাইয়া বসিল। অতীতের কত মধুর-স্মৃতি তাহার মানসপটে উদয় হইয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সেই শৈশবের হাসি-তামাসা, রওশনকে পড়াইতে বসিয়া সিলেটে

চিঠি লেখালেখি, হাস্ত-কৌতুক, মান-অভিমান, সেই চপল ভালবাসাবাসি নিবেদন, এই সব চিন্তা আবার তাহাকে রওশনের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিল। তাহার যেন বার বার মনে হইতে ছিল সে তাহার প্রতি অন্যায় করিতেছে—রওশনের কোন দোষ নাই।

ভাবনার বিরাম নাই—বেগম সাহেবার স্নেহে হয়ত কৃত্রিমতা ছিল কিন্তু রওশনের মধ্যে ত কোন দিন কৃত্রিমতা সে দেখে নাই। সে তাহার পরিপূর্ণ কুমারীচিত্ত লইয়াই তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে ভালবাসা কোনদিন বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও তাহার ত অজানা ছিল না। তাহারা একে অন্যকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসাকে সে ত কোন দিন ক্ষুণ্ণ করে নাই। বাহিরের দুনিয়ার মিথ্যা প্রতিবন্ধতার প্রতিফল সে কেন একা ভোগ করিবে?

তাহার অন্যায় সন্দেহের জন্য তাহার ক্ষমা চাহিয়া লইতে হইবে। কেমন করিয়া একবার রওশনের সঙ্গে দেখা করা যায়—বিদায় কালের শেষ দেখা হয়ত বা জীবনের শেষ দেখা! আকাশ পাতাল ভাবিয়া সে কিছু ঠিক করিতে পারিল না। একবার মনে করিল কোন দাসীকে দিয়া গোপনে সাক্ষাৎ

করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠায়, আবার মনে হইল এই রকমভাবে সে না আসিতেও পারে, আসিলেও নিরাপদ নয়, এই সব ব্যাপারে তৃতীয়ের বিশেষ করে, তৃতীয়ার উদয় ভাল নয়। কাল সে চলিয়া গেলে লোকের কাণে কাণে ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে। তখন হতভাগিণী নারী—এক আঘাতেই অর্দ্ধমৃতা হইয়া রহিয়াছে আর এক আঘাত কী সহিতে পারিবে? সাত পাঁচ ভাবিয়া ঠিক করিল, না বেগম সাহেবাকেই বলি—কিন্তু অপরিসীম লজ্জা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সে বিছানা হইতে উঠিয়াই আবার শুইয়া পড়িল—ভাবিতে ভাবিতে কখন যে তন্দ্রা আসিয়া পড়িল তাহার খবরও রহিল না।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাড়ীর এক পুরাতন চাকরাণী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। তারপর বুড়ী কাপড়ের খুঁট খুলিয়া একটুকরা কাগজ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। কাগজ খুলিয়া পড়িতেই তস্‌লীমের দেহ মন কাঁপিয়া উঠিল। অপূর্ব্ব পুলকরোমাঞ্চের মধ্যে সে কাগজখানি পাঁচ সাত বার পড়িয়া দেখিল। কাগজখানিতে একটিমাত্র ছত্র লেখা ছিল, তাহা এই—রাত্রি একটা বাজিতেই আমাদের ভিতরের উঠানে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, কথা আছে। রওশন।

কি কথা আছে?—নানা সম্ভাব্য অসম্ভাব্য চিন্তা আসিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কি কি কথা বলিবে, কি বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইবে, সে বা কী বলিবে, সে আজ দেখিতে কেমন হইয়াছে। তাহাকে দেখিতে পারিবে এ সব আনন্দ-চিন্তায় রাত্রি একটা হইয়া গেল।

খুব সন্ত্রস্ততার সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া ধীরপাদবিক্ষেপে তস্‌লীম ভিতরের উঠানে যাইয়া দাঁড়াইল। ভিতর বাড়ীর দুয়ার জুড়িয়া কুকুর শুইয়া ছিল, তাহার সাড়া পাইতেই ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি কাছে যাইয়া কুকুরের মাথায় হাত বুলাইতেই কুকুর চুপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলিয়া ধীরে ধীরে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা রওশন বাহির হইয়া আসিল। তসলীমকে সালাম করিয়া তাহার ও বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল—তাহা সামলাইয়া লইয়া সে নিজকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিল। অবলীলাক্রমে তস্‌লীমের যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল—তস্‌লীম স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু উত্তর দিয়া যাইতেছিল। আর সে আধো-আঁধার নিশিথে তাহার আশৈশবের বাঞ্ছিতাকে যেন দুই চোখ ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

চৌত্রিশ

শেষে রওশন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—আপনার সন্দেহ এখনো যায়নি, না? অভিভুত তস্‌লীম আমতা আমতা করিয়াই জবাব দিল, না, আমার কোন সন্দেহ নাই। 'ঐ না'ই ত বল্‌ছে হাঁ, মনের গোপন তলে সন্দেহ আছে, আচ্ছা, যদি একটি কথা রাখেন আমি সব খুলে বলতে পারি'। তস্‌লীম স্বীকৃত হইল।

'ওয়াদা করিতে হবে, আমার কথা শুনে বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন আমাদের বিয়ের কথা আর উঠাতে পারবেন না।'

তস্‌লীম বলিল 'তা, কেন, আরও ত বহু ওয়াদা হতে পারে।'

রওশন জানাইল তা না হলে সে সব কথা খুলে বল্‌তে পারে না।"

সেই রহস্য-ঘেরা কথা, যাহা এতদিন তাহাকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারিয়াছে, আজও যার সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে একটু খুঁৎ খুঁতি রহিয়া গিয়াছে, সে সব জানিবার জন্য তাহার চিত্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিল—সে রহস্যের দ্বারোদঘাটন হইবে, তার জন্য যে কোন ওয়াদা সে করিতে পারে। তার উপর সে জানে তাহারই রওশন, সে যখন চাহিবে

তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না ইত্যাদি ভাবিয়া সে বলিল আচ্ছা।

'তবে আসুন' বলিয়া রওশন আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। বাহিরে দেউড়ী ঘরের সম্মুখেই পুকুর পারে মসজিদ, অবিচলিত পাদবিক্ষেপে রওশন মসজিদের উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল তসলীম যন্ত্রচালিতের মত তাহার অনুসরণ করিতেছিল। মসজিদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া রওশন আঁচলের ভিতর হইতে একখানা মোটা কি বই বাহির করিল—তারপর তস্‌লীমের দিকে তাকাইয়া বলিল—সাম্‌নে মসজিদ আর হাতে এই কোরাণ এই নিয়ে বল্‌ছি আমার উপর যে-সব দোষারোপের গুজব উঠেছিল সব মিথ্যা। সব বানানো কথা। তারপর একটু ঢোক গিলিয়া রওশন বলিল, 'আমি জানি এরকম ভাবে এ-সব কথা বলাতে আমার নিজকে অপমান করছি—এ-রকমভাবে বলে বিশ্বাস উৎপাদনের কোন দরকার ছিল না এবং তার কোন মূল্যও নেই তথাপি দেখলাম আপনি অনর্থক একটা মিথ্যা আগুণে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হচ্ছেন, অহরহ আপনার ভিতর একটা আগুণ জ্বল্‌ছে, আমার বোধ হচ্ছে সে আগুণকে চাপা দেবার জন্যই আপনি আপনার দেহকেও আগুণের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—যাক্ মনে

করছিলাম বিশ্বাস করতে পারলে আপনি হয়ত শান্তি পাবেন। আচ্ছা মাফ করবেন আসি, এই বলিয়া ছোট্ট একটি সালাম করিয়া ধীরে ধীরে সে ভিতর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

তস্‌লীম স্তব্ধ হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যে কিছুই বলা হয় নাই। কত কথাই না মনে করিয়াছিল। বহুদিন পর দেখা, আবার বহুদিনের জন্য, হয়ত জন্মের জন্য ছাড়াছাড়ি। শতপ্রকারে তাহাকে কষ্ট দিয়াছে, অন্যায় সন্দেহকে মনে স্থান দিয়া সেই দেবীপ্রতিমাকে অপমান করিয়াছে। একটু ক্ষমা চাহিবার অবসর ও পাইল না। আহাম্মক বেকুব সে তাই কথা বলে নাই, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে সে বিছানায় আসিয়া উপুর হইয়া শুইয়া পড়িল আর আত্মধিক্কারে এবং অনুশোচনায় তাহার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কান্না আসিল।

পরদিন নানা চিন্তা আসিয়া তস্‌লীমকে ভাবাইয়া তুলিল। তবে এ-ভাবনায় দাহ নাই। গত রাত্রির পর হইতে তাহার মনের জ্বালা জুড়াইয়াছে—সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বহুদিন পরে একটু আরাম বোধ করিল।

বঙ্গ-ভূমির মুখ-উজ্জ্বল করার চাইতে এখন যেন সে আর একটী মুখের ঔজ্জ্বল্যে আবার নূতন করিয়া বাঁধা পড়িল।

চৌচির

আজ তাহার যাইবার দিন ছিল—কিন্তু কী ভাবিয়া সে আজ যাইবার জন্য কোন তাড়াহুড়া করিল না—তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় সে যেন হা করিয়া আছে কেহ আজ তাহাকে থাকিয়া যাইতে বলে কিনা!

বেগম সাহেবা মনে করিয়াছিলেন—সে কিছুতেই থাকিবে না। তথাপি তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আজকার দিনটা থাকিয়া গেলে হয় না?

সে একটু অনাবশ্যক রকম চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল—'রেজিমেণ্ট' কলিকাতা থেকে পঁচিশে রওয়ানা হবার কথা—আজ ত বিশ। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আবার বলিল—আচ্ছা, আপনি যখন বল্‌ছেন—একদিনে কী আর এসে যাবে?

সারাদিন ভাবিয়া ভাবিয়া সে ঠিক করিল কি কি বলিবে। মনের ভিতর এক একটা কথা শতবার করিয়া রিহার্শাল দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় বুড়ি দাসীকে ডাকিয়া তাহার হাতে একটা সিকি এবং এক টুক্‌রা কাগজ গুঁজিয়া দিল। এ সব বুড়ীদের বেশী কথা বলিতে হয় না, তাহারা যৌবনের রঙীন স্মৃতি টানিয়া আনিয়া সব বুঝিয়া লয়।

চৌত্রিশ

রাত্রি একটায় আবার উঠানে দেখা হইল।

রওশন ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, তার মুখ দিয়া আজ আর কথা সরিতেছিল না।

তস্‌লীম কিন্তু আজ দৃঢ়। উঠানে দাঁড়াইয়া কথা বলা যায় না—কাজেই তস্‌লীম ভিতরের পুকুর পাড়ে যাইবার ইঙ্গিত করিতেই রওশনও একটু কী ভাবিয়া লইয়া বিনা দ্বিধায় চলিল, ভিতরে ভিতরে তাহার মনে অজ্ঞাত শঙ্কা হইলেও তস্‌লীমকে শঙ্কা করিবার তাহার কিছুই ছিল না। সুযোগ সময়কে আজ কোন প্রকারে গলিয়া যাইতে দিবে না এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া তস্‌লীম বিনা ভূমিকায় তাহার অন্যায় অবহেলা ও সন্দেহের জন্য রওশনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। রওশন ত প্রথমে নির্ব্বাক। তারপর ধীরে ধীরে অভিমান ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল ক্ষমা করবার কী আছে, দশজনে যা বিশ্বাস করেছে আপনিও ত মাত্র তাই বিশ্বাস করেছেন, তার বেশী ত কিছু করেন নি—'এই বলিয়া সে একটুখানি হাসিল, সে হাসি অশ্রুর নামান্তর মাত্র। এ-সব বিষয় পীড়াপীড়ি করিয়া তাহার এই অমূল্য সময় নষ্ট করিতে তস্‌লীমের আদৌ ইচ্ছা নাই, সে তাড়াতাড়ি তাহার মনের আসল কথাই বলিয়া ফেলিল, "আমি কাল মাকে বলব, আমাদের বিয়ে হয়ে যা'ক। আমার

মা বাবাও রাজী হবেন”। রওশন লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেল, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মাটি খুড়িতে খুড়িতে বলিল—‘কাল্ আপনি কী ওয়াদা করলেন—’

সে ওয়াদা খেলাপের জন্য যত পাপই হউক তার জন্য আমিই দায়ী।’

‘না, আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন, যান্।’

‘না, আমি Medical certificate দেব, যাব না—আর নেহাৎ যেতে হলেও পরের বে’সে যাব।’

‘না, আমি আপনাকে ওয়াদা খেলাপ করতে দেব না’ তাহার কণ্ঠ এবার দৃঢ়।

—‘এ-শপথের পর যদি বিয়ে হয় এটা কিছুতেই অসম্ভব নয় যে, আপনার বা যারা জান্‌বে তাদের মনে এরকম একটা ভাব আসতে পারে, এ বিয়ের জন্যই আমি কোরআন ও মস্‌জিদ নিয়ে মিথ্যা শপথের ভান করেছি, সেদিন যে অসহনীয় লজ্জা আমাকে পীড়া দেবে তা সহ্য করতে আমি পারব না, তাই আমি আপনার কাছ থেকে ওয়াদা করিয়ে নিয়েছিলাম, বিয়ের কথা তুল্‌তে পারবেন না।’

‘না, রওশন—’

তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না, রওশন একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—'আপনার কাছেই ত কতবার শুনেছি প্রকৃত ভালবাসা মনে, দেহে নয়। আর দুইটী মনের একান্ত যে ভাল-বাসা তাহা বিবাহের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের চাইতে অনেক বড়, আজ সে কথা আপনি নিজেই ভুলে যাচ্ছেন'—তারপর আবার হাসিল, সে হাসি মেঘে ঢাকা চাঁদের মত ম্লান—'আচ্ছা আপনি কী আমায় ভালবাসেন মনে করেন ? আমার ত মনে হয় না। আর ভাল যদি বাসেন তাও আর দশজনের মতই ; দশজনকে ছাড়িয়ে যখন উঠ্‌তে পারেন নি, তখন অনর্থক একটা বাহিরের অনুষ্ঠান পালন করে, আত্মবঞ্চনা করে কী লাভ ?' অভিমানে তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠ বাষ্পারুদ্ধ হইয়া গেল—'আমার নামে বদনামী উঠেছিল তা'ত আপনি অস্বীকার করতে পারেন নি। আমার মধ্যে যদি গুণ থাকে তা দেখে ত করিম রহিম যে কেউ আমাকে ভালবাস্‌তে পারে—আমার কলঙ্ককে ভালবাসা সে অমূলক হউক বা সমূলক হউক সে শুধু একজনের কাছে আশা করে ছিলাম—' সে আর বলিতে পারিল না। উভয়ে নির্ব্বাক। সেই নিস্তব্ধ নিশীথ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুকুরের মধ্যে এক সঙ্গে দুইটী ডাহুক কোয়া কোয়া করিয়া উঠিল।

চৌত্রিশ

রওশন নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—'তবে আসি—'

তস্‌লীমের দেহ মন কাঁপিতে লাগিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'তা হলে এতদিনের আশা ভরসা সব'—কথাগুলি যেন ব্যথার গলিতস্রাব, ব্যথায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

রওশনের পা কাঁপিতে লাগিল, সে একটী চাড়া গাছ ধরিয়া লইয়া বলিল—'আপনি এক মহৎ কাজে যাচ্ছেন, তা' থেকে মন ফিরাবেন না—সমস্ত দেশ আপনাদের বিজয়ীবেশে—ফেরা পথের দিকে চেয়ে থাকবে……'তার পর হাসিবার চেষ্টা করিল।… 'আমার যা পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি, তাই আমার আর বেশী গরজ নেই—আচ্ছা, বিয়েটাই কী একজন একজনকে পাওয়ার সব চাইতে বড় উপায়? বিয়ে না হয় হল; আমি আপনার ভাত রাঁধুনী হলাম, হয়ত বা দু' একটী সন্তানের জননীও হলাম, আপনিও বাবা হলেন, আমার খোরপোষ জোগালেন, এইটীই কী সব চাইতে বড় পাওয়া?'

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—'আর আপনি যদি নেহাৎ নাছোরবন্দা হ'ন, ফিরে আসুন, তারপর দেখা যাবে…।

সে গভীর নিশীথে এই দুইটী প্রাণীর বিদায় বেলার দৃশ্য এতই করুণ ও মর্ম্মন্তুদ যে তাহা দিনের আলোকে অসহ্য।

চৌচির

তস্‌লীম যখন যুদ্ধে চলিয়া গেল, তখন বেগম সাহেবা তাহার সঙ্গে রওশনের বিবাহের আশা একরকম ছাড়িয়াই দিলেন। বাবা আমার হায়াৎ-মউতের পথে গিয়াছে, খোদা তাহাকে ফিরিয়ে আনুন্ কিন্তু যাইবার সময় তাহার ইচ্ছা কী সে ত কিছুই বলিয়া গেল না, তবে কী তার সন্দেহ এখনো যায় নি?ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে বেগম সাহেবা মনে করিলেন, এই রকম ভাবে রওশনকে আর কতদিন রাখিয়া দিব, তাহার জীবনটা আমিই নষ্ট করিলাম। এমনি চিন্তা করিতে করিতে তাহার চোখমুখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

অন্তের দ্বারা কথা বলা সব সময় নিরাপদ নহে, বিশেষতঃ মেয়েদের দ্বারা; ওঁদের পেটের কথা অন্যকে না বলিয়া থাকিতে পারে এ কেহ শপথ করিয়া বলিলেও বিশ্বাস করা যায় না। বেগম সাহেবা একদিন রওশনকে ডাকিয়া নিজেই তাহার মাথা আঁচড়াইতে বসিলেন—তারপর ধীরে ধীরে কথা পাড়িলেন। সে স্বর বড় করুণ শ্রোতার অন্তরে গিয়া বিঁধে—'মা তোমার ত কোন সুরাহা করে দিতে পারলাম না, শরীর আমার দিন দিন যে রকম ভেঙ্গে পড়ছে, কোন্ দিন খোদার শেষ পরওয়ানা এসে পৌঁছে··· মরণেও যে আমার মনে দাগ থেকে যাবে।' মায়ের ব্যথাক্লিষ্ট

অন্তরের ছোঁওয়া কন্যারও মন গলাইয়া দিল। কোন লজ্জাই আজ তাহার মনে স্থান নিতে পারিল না। সেও অসঙ্কোচে উত্তর করিল—'না, মা, আমার জন্য আর কিছু করতে হবে না, তুমি দাদাদের বৌ আন, আমি তাদের নিয়ে সুখে থাকতে পারব।' মা আর অশ্রুরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না—তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল. কত বড় ব্যথায় আজ তাঁহার কন্যা পাষাণে বুক বাঁধিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল—তিনি কন্যার অর্দ্ধসমাপ্ত মাথা রাখিয়াই উঠিয়া গেলেন।

তস্‌লীম মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখে, সে সব চিঠিতে যুদ্ধের এবং তাহার সৈনিক জীবনের বর্ণনা ছাড়া বিশেষ কিছু থাকে না। তাহাদের সৈনিক জীবনের ভয়াবহ কাহিনী শুনিয়া বেগম সাহেবার চোখমুখ কালো হইয়া উঠে, তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে প্রার্থনা জাগে খোদা, তাকে বাঁচিয়ে রাখুন। রওশনের অস্বাভাবিক ব্রীড়া এখন কাটিয়া গিয়াছে—সে নিজেই এখন তস্‌লীমের কাছে চিঠিপত্র লেখে, তাহাতে সে এখন লজ্জা বোধ করে না। এ যেন তাহার পূর্ব্বেকার তস্‌লীম ভাই।

বেগম সাহেবা নিজের মেয়েকে ভাল করিয়াই জানিতেন—তিনি চেষ্টা করিয়া যখন রওশনকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারি-

লেন না, তখন তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন, বুঝিলেন কিছুতেই তাহাকে রাজী করা যাইবে না। তখন তিনি পুত্রদের বিবাহের দিকে মনোযোগ দিলেন। তাঁহার মনের যে অবস্থা, এ অবস্থায় বেশী হৈ চৈ করিয়া বিবাহানুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এ শুধু কর্ত্তব্য-পালন—তিনি দুইটী পুত্রেরই বিবাহ ঠিক করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বড় পুত্রটী বি, এ পাশ করিয়া আসিতেই তাহাকে সম্পত্তির ম্যানেজার করিয়া দিয়াছেন। স্বামীকে ম্যানেজারী লইতে ডাকিয়া ছিলেন, তিনি মান করিয়া আসেন নাই। পুত্রদের বিবাহে স্বামীকে আসিতে লিখিলেন, তিনি আসিবেন না জানাইলেন। পরিশেষে পুত্রদের লইয়া তিনি বাঁশ বাড়িয়ায় গিয়া হাজির হইলেন, হাতে ধরিয়া মাফ্ চাহিলেন—কিন্তু স্বামীর রাগ পড়িল না।

অল্পদিন আগে মাত্র তিনি একটী বিবাহ করিয়াছেন, তিনি নিজে এখন বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, কাজেই একটু কাঁচা বয়স দেখিয়া বৌটি আনিতে হইয়াছে, বুড়ীতে বুড়ার খেদমত চলে না।—তিনি অনেক মান অভিমানের কথা বলিলেন বটে, আসল কথা এমন অনবসরতার মধ্যে তাহার যাইবার অবসর কোথায়!

অগত্যা বেগম সাহেবা আসিয়া নিজেই সমস্ত যোগাড়যন্ত্রে লাগিয়া গেলেন—। বিবাহের দিন বরযাত্রীদের যাত্রার সময় হঠাৎ হামীদ সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তাজ্জব হইয়া গেল।—তিনি হাসিয়া বলিলেন—আমার ছেলেদের মন ছোট হবে, তাই কাজ ফেলে চলে আস্‌লাম!—

রওশনের দিন আর কাটে না, নূতন ভাবীদের লইয়া কিছুদিন বেশ ফুর্ত্তিতে কাটিল বটে কিন্তু পরে বুঝা গেল তাঁহারা রওশন অপেক্ষা স্বামী লইয়া মসগুল থাকিতেই বেশী লাভজনক মনে করেন! বড় ঘরের মেয়ে কাজকর্ম্মও বেশী করিতে হয় না—করিতে চাহিলেই দাস দাসীদের জন্য পারা যায় না। শুধু বই পড়িয়া পড়িয়া দিন আর কত কাটে, কাজেই সে মাকে ধরিয়া বসিল তাহার জন্য একটী মেয়ে শিল্পী ঠিক করিয়া দিতে হইবে—সে পেণ্টিং শিখিবে। মা ছেলেদের বলিয়া একজন ভাল মেয়ে শিল্পী ঠিক করিয়া দিলেন।

নানা দিকের ব্যথায় বেগম সাহেবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—তিনি আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিবেন না, এ কথা তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন বাহিরের লোকেও তাঁহার শরীর দেখিয়া তাহা ধারণা করিয়া লইয়াছিল। কাজেই তিনি পুত্র ও

পুত্রবধুদের ডাকিয়া রওশনকে দেখিবার জন্য এবং তাহার যাতে কোন অভাব না হয় তাহার জন্য আদেশ, উপদেশ ও অছিয়েত করিয়া গেলেন।

সত্য সত্যই একদিন শেষ পরওয়ানা আসিয়া হাজির হইল—ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একদিন, মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে কন্যা রওশনের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে তিনি অশ্রুজলের মধ্যে চিরতরে ডুবিয়া গেলেন।

রওশন এখন সারাদিন তুলি লইয়াই দিন কাটায়—তাহার নিজের ঘর অর্গলবদ্ধ করিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া বসিয়া সে সারাদিন ছবি আঁকে। কি ছবি আঁকে কাহারও দেখিবার যো নাই। তাহার ভাইরা, ভাবীরা কতবার চেষ্টা করিয়াছে কি ছবি আঁকে দেখিবার জন্য কিন্তু সে কাহাকেও দেখিতে দেয় না—আঁকা হইলেই সব বন্ধ করিয়া রাখে। দুঃখিনী বোনটি পাছে মনে ব্যথা পায় ভাবিয়া তাহারা কেহ বেশী জোর জবরদস্তি ও করে না।

তস্‌লীম বেগম সাহেবার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর জন্য সে নিজে যে অনেকখানি দায়ী সে চিন্তা আসিতেই তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহার জন্য

এ মহিমময়ী নারী কি না করিয়াছে! পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাকে চৌদ্দ পনর বৎসর ধরিয়া পালন করিয়াছেন, তাহার মত সামান্য গৃহস্থ সন্তানের সঙ্গে জমিদার কন্যার বিবাহ দিতে চাহিয়াছেন, তাহার জন্য নিজের স্বামীর সঙ্গে চিরতরে ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়াছেন নিজের আদুরে কন্যার জীবনটি নষ্ট করিয়াছেন, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহার মন কাঁদিয়া উঠিল! আগামী মাসে armistice যুদ্ধ বিরতি সন্ধি হইবে, তখন তাহারা দেশে ফিরিবার অনুমতি পাইবে। হায়, মাত্র এক মাসের জন্য সে বেগম সাহবাকে দেখিতে পারিল না। তাহার অন্যায় অপরাধের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা লওয়া হইল না, ইত্যাদি চিন্তা আসিয়া তাহার মনে আত্ম ধিক্কার জন্মিল।

কিন্তু armistice যখন হইল, তখন তস্‌লীমের দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল না। এতদিন ইউরোপের রণক্ষেত্রে ঘুরিয়াছে। ইউরোপকে ত কিছুই জানা হইল না। এমন কি নাম করা শহরগুলিই ত দেখা হইল না। কাজেই তাহার ইচ্ছা হইল, ইউরোপে কিছুদিন বেড়ায়—ঘুরিয়া ফিরিয়া তারপর দেশে ফিরিবে। ইউরোপ ভোগের রাজধানী। এতদিন কঠোর সৈনিক জীবনে থাকিয়া তস্‌লীম তাহা পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে

পারে নাই। এখন ইউরোপীয় সমাজ-জীবনে মিশিয়া দেখিল এখানে ভোগের উৎসব বড় বেশী। পশ্চিমের ভিতরের জীবনের সঙ্গে মিশিবার তাহার খুব সুযোগ জুটিয়াছিল কারণ তখন যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকদের রাজসম্মান, যেখানে সেখানে সাদর নিমন্ত্রণ, মেয়ে মহলে ত কথাই নাই।

চতুর্দ্দিকের ভোগলালসার বহ্নি শিখার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহারও ক্ষুধিত দেহমন যে মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই তাহা নহে কিন্তু যখনই মনে পড়িয়াছে আর একটী প্রাণী সারাজীবন দেহমনে তাহারই জন্যে রোজা রাখিয়াছে, তখনই তাহার দেহমন শান্ত সমাহিত হইয়া পূজারীর মত হইয়া উঠিয়াছে। তখনি চোখ ফিরাইয়া সে অন্যদিকে ছুট্ দিয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে শেষকালে তস্‌লীম ইটালীতে আসিয়া পৌঁছিল। ইটালী মিউজিয়মে রাফেল হইতে আরম্ভ করিয়া ইটালীর অতীত ও বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের চিত্রকলা দেখিতে দেখিতে তাহার মনে আবার নূতন খেয়াল চাপিল।

মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারা প্রকাশের চিত্রশিল্প এমন উত্তম বাহণ, তাহা কি মানুষের ধর্ম্ম ইসলাম হারাম করিতে পারে? মানুষের ভাবধারার ইতিহাসে মানব চিত্তের

জ্ঞানের অভিযানের এ অখণ্ড বিকাশ ইহার চর্চ্চা ইসলাম নিষেধ করিতে পারে, এই কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহার যেন কেন মনে হইতেছিল এ আমাদের ইসলামকে বুঝিবার ও বুঝাইবার ভুল! রাফেলের মেডোনা মাতৃচিত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে তন্ময় হইয়া গেল। বাস্তব মূর্ত্তিতে মাতৃত্বের এ পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইল—যিনি মানুষকে তাহার একটি সর্ব্বোত্তম অনুভূতির বাস্তবচিত্র আঁকিবার এমন ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে তাহার মাথা বার বার নুইয়া পড়িতেছিল।

এটা হারাম ওটা নাজায়েজ এই করিয়া বিশ্বের এ জ্ঞানের অভিযানে আধুনিক মুসলমান তাহার হক আদায় করিতেছে না, এই জন্য একদিন তাহাকে পস্তাইতে হইবে, এই ভাবিয়া তাহার দুঃখ ও আপসোস্ হইতেছিল। নানা ঝড় ঝঞ্ঝায় তাহার নিজের জীবন বিড়ম্বিত, তথাপি এদিক দিয়া কিছু করিতে পারে কি না ভাবিয়া সে একদিন ইটালীর এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর শিষ্য হইয়া পড়িল।

নানা বই পড়িয়া, ছবি আঁকিয়া, একা নিঃসঙ্গ জীবনে চিন্তা করিতে করিতে রওশনের মনে মানব জীবন, মানুষের ভবিষ্যৎ,

নর-নারীর সম্বন্ধ ইত্যাদি নানা জটিল বিষয়ে এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খাইতে লাগিল। অথচ এ সব বিষয় আলোচনা করিবার লোক না থাকাতে সে ভয়ানক অসুবিধা ও নিরানন্দ বোধ করিতেছিল। যতক্ষণ তুলি লইয়া থাকে, বেশ, কিন্তু তুলি ছাড়িয়া উঠিলেই ইচ্ছা হয় এ সব বিষয় লইয়া কাহারও সঙ্গে আলোচনা করে, তর্ক করে, সিদ্ধান্ত করে।

তস্‌লীমের কাছে সে এখন অসঙ্কোচে পত্র লেখে। তাহার কৌতূহল, চিন্তা, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি অন্য কোন রকমে প্রকাশ না পাইয়া, ধীরে ধীরে এ সব চিটির মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

রওশনের চিঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনেও সে সব চিন্তা নানাভাবে উদয় হইতে লাগিল। রওশনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই বটে কিন্তু সত্যই সে কী রওশনকে পায় নাই? তাহারা কোন দিন পরস্পর একটিবার চুম্বন করে নাই; রওশন বড় হইয়াছে অবধি কোনদিন তাহাকে স্পর্শ করে নাই সত্য; তথাপি সে কী তাহাকে পায় নাই বলিতে পারে? বিবাহ ত অনেকেই করিয়াছে, তাহারা কয়জন নিজেদের স্ত্রীকে এমনভাবে পাইয়াছে? সেই কৈশোরের ভালবাসার উন্মেষ হইতে আজ পর্য্যন্ত সে কী

এক মুহূর্তের জন্যও রওশনকে ভুলিতে পারিয়াছে? —এই না-পাওয়ায় পাওয়ার উন্মুখ প্রতীক্ষা যে কত মধুর, কত আনন্দ-দায়ক তাহা ত বলিয়া বুঝাইবার নয়!

কাজেই তস্‌লীমও খুব আগ্রহের সহিত পত্র মারফৎ, এ সব বিষয় আলোচনায় লাগিয়া গেল। প্রতি সপ্তাহে পত্র দীর্ঘ হইতে দীর্গতর হইতে লাগিল, নূতন নূতন আলোচনা, জিজ্ঞাসা সমাধান যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

তস্‌লীম বাড়ী যাইবে না বলিয়াই ঠিক করিল, পাছে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, না পাওয়ার উন্মুখ প্রতীক্ষার আনন্দ পাওয়ার অবসাদবিসাদে ভরিয়া উঠে। বেগম সাহেবা নাই বটে, তথাপি কে জানে কোন্ শক্তি আবার তাহাদিগকে মিলনের পথে ঠেলিয়া দেয়!

সোমবার সকালে উঠিয়া তস্‌লীম মাত্র চা খাইয়া সিগার ফুকিতেছে, তখনুই পিয়ন টেবিলের উপর এক টেলিগ্রাম আনিয়া দিল।

আজ কয়েকদিন হয় তাহার মা মারা গিয়াছেন, তাহার পিতা আগামী মাসে হজ্জে যাবেন, সে যেন শীঘ্র আসে—টেলিগ্রামের এই মর্ম্ম।

কাজেই আর দেরী করা যায় না—তাহার ল্যাঠা ত কিছুই নাই, কালই যাত্রা করা যাইবে ঠিক হইল।

সন্ধ্যার ডাকে আবার সে রওশনের এক চিঠি পাইল। মার মৃত্যু সংবাদে তাহার মন আজ মোটেই ভাল নয়—না হয় রওশনের চিঠি তাহাকে অসামান্য ক্ষীপ্র ও উদ্যমশীল করিয়া তুলিত; এতক্ষণ চিঠিখানি পাঁচ সাতবার পড়িয়া ফেলিত। তাহাদের চিররহস্যময় আলোচনার লোভও আজ তাহাকে বেশী উৎসাহিত করিতে পারিল না।

সুইজ টিপিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া দেখিল প্রায় পৃষ্ঠা দশেক হইবে—সেই নরনারীর চিররহস্যময় সম্বন্ধের আলোচনা। চিঠিখানি বারকয়েক পড়িল। রওশন শেষকালে নিজেদের জীবনের উদাহরণ দেখাইয়া লিখিয়াছে…আমরা কী পরস্পরকে কোন বিবাহিত নরনারীর চেয়ে কম পেয়েছি? আমরা হয়ত বলতে পারি না, কিন্তু আমার কথা বল্‌তে পারি আমার চেয়ে কোন্ বিবাহিতা নারী তার স্বামীকে বেশী পেয়েছে এ আমি ধারনা করতে পারি না—এই রকম বলাতে হয়ত পাপ হচ্ছে কিন্তু সত্যকে নিরুদ্ধ করার জন্য অন্তরে যে পীড়া তাহা এ পাপের শাস্তির চাইতেও কঠোর। এমন মুহূর্ত্তের কথা বল্‌তে পারি না,

যখন ভুল্‌তে পেরেছি। এমন মুহূর্ত্ত দিয়ে কোন্ স্ত্রী তার স্বামীকে পেয়েছে? অথচ পাওয়ার অবসাদের পীড়ায় তাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যে নিত্য কেলেঙ্কারী ঘট্‌ছে তা ত আমাদের জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ঘটেনি।—আমাদের এ নিঃস্বার্থ ভালবাসা বড়, না তাদের ব্যবসা বড়? ব্যবসা নয় ত কী? একজন ভাত রাঁধ্‌বে সন্তান ধারন করবে, আর একজন খোর-পোষ যোগাবে' কোন দিকে অন্যায় হলে নালিশ করে যে যার হক আদায় করে নেবে এর চাইতে আর বড় ব্যবসা কী হতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরদিন ষ্টিমারে উঠিবার আগে তস্‌লীম নিজ বাড়ী ও মিএর বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া দিল—সে যাত্রা করিয়াছে, ৩রা আগষ্ট দেশে পৌঁছিবে।

পথে নানা চিন্তায় তাহার মন ওলট-পালট হইতে লাগিল।

তাহার দুইটি মা ছিল সে যাইয়া একটীকেও দেখিতে পাইবে না, তাহার হৃদয় মোচড় দিয়া উঠিল। রওশন কেমন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে দেখা হইবে নিশ্চয়ই, কেহ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে কী করা যাইবে। ইত্যাদি হর্ষ-বিষাদের চিন্তার মধ্যে তাহার পথ ফুরাইয়া গেল।

তরা আগষ্ট ষ্টিমার ঘাটে নামিয়া দেখিল বড় একটা কেহ আসে নাই—কয়েকজন বাহিরের লোক আসিয়াছে, যুদ্ধ-ফেরৎ বীরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। মিঞা বাড়ী হইতেও কেহ আসে নাই, তাহারা সোপারকে দিয়া শুধু গাড়ীখানি পাঠাইয়া দিয়াছে। সোপারের কাছে ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একজন্ ছোক্‌রা 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল আর সমবেত কণ্ঠে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিল। সে ধ্বনি তস্‌লীমের অন্তরে গিয়া বিঁধিল, তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতেও যেন প্রতিধ্বনি জাগিল—হাঁ তুমিই বড়।

সে গাড়ীতে যাইয়া উঠিতেই জনৈক অভ্যর্থনাকারী বন্ধু তাঁহার গলায় একটী ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া হাততালি দিয়া উঠিল। যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সেই সাথে যোগ দিয়া স্থানটীকে সরগরম করিয়া তুলিল!

এই বিসদৃশ্য কাণ্ডকারখানায় তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল—অথচ কিছু বলিতেও সঙ্কোচ হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে মালাটী গলা হইতে নামাইয়া রাখিয়া অধোবদনে বসিয়া

পড়িল। সারাপথ সে একটী কথাও বলিতে পারিল না—সঙ্গে দুই একজন যাহারা গাড়ীতে উঠিয়াছিল তাহারা অবাক্ হইয়া গেল।

মিঞাবাড়ীর দেওড়ীর সামনে গাড়ী থামিতেই দেখিল—মহাল্লার লোকেরা খাটিয়ার জন্য বাঁশ গাছ কাটিতেছে, তস্‌লীমের মন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাহাদের দা'র এক একটী কোপ যেন তাহার কলিজায় যাইয়া পড়িতেছিল। বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে ভিতরে যাইয়া ঢুকিল—ছেলেরা তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল—সেও আর অশ্রু রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না! যাহাকে জীবনের বহুবর্ণে দেখিবে ভাবিয়াছিল আজ তাহাকে মরণের শ্বেতবর্ণে দেখিতে হইল।

গাড়ীর ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যায় একটা মিটিংটিটিং করিবে বলিয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। কিন্তু এখানকার হালচাল দেখিয়া তাহারা ত একেবারে থ। জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিল তাহাতে তাহাদের সব উৎসাহ কর্পূরের মত উড়িয়া গেল।—কাল রাত্রে এ বাড়ীর একটী মেয়ে হার্ট ফেল করিয়া মারা গিয়াছে। অগত্যা তাহারা মুখ কালো করিয়া চলিয়া গেল।

রওশনকে কবর দিয়া আসিয়া সন্ধ্যায় তস্‌লীম তাহার ঘরে যাইয়া বসিল। চতুর্দ্দিকের আলো বাতাসে সে যেন রওশনের ছোঁওয়া অনুভব করিতেছিল। টেবিল, চেয়ার, আলমারী সব জিনিষেই যেন তাহার গন্ধ লাগিয়া আছে। তস্‌লীম তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাই যেন তৃষিতের মত পান করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর রওশনের বড় ভাই আসিয়া বলিল—'সে আজ কয় বৎসর ধরে শুধু ছবি এঁকেছে; কিন্তু ছবি এঁকেছে বটে, কী ছবি এঁকেছে কাকেও একদিনের জন্যেও তা দেখায় নি, ঐ আলমারীটা খুলুন আমি দেউড়ি থেকে আসছি' এই বলিয়া চাবির গোছাটা তস্‌লীমের হাতে দিয়া সে চলিয়া গেল।

তস্‌লীম অতি কৌতুহলের সঙ্গে আলমারী খুলিল—তাহার প্রাণ দুরু দুরু করিতেছিল।—

চোখ পড়িতেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল—কত বিচিত্র ভাব ও বেদনার অভিব্যক্তি এই ছবিগুলি! কয়েকখানি তার নিজেরই প্রতিকৃতি, শিল্পীর বেদনা-সুন্দর তুলিকায় সে সব কি অপরূপ হইয়াই না উঠিয়াছে। তার নিজের এই অভিনব ভাব সুন্দর প্রতিকৃতিগুলি দেখিয়া তস্‌লীম অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল।

এ ছবির প্রতি রেখায় রেখায় সেত মিশিয়া আছে—তাহার দৃষ্টি, তাহার ছোঁওয়া, তাহার অনুভূতি, প্রেরণা সবই ত এ মূর্ত্তিমান ছবি। তস্‌লীমের উদগ্র ইন্দ্রিয় তাহাই বুভূক্ষের ন্যায় গিলিতে লাগিল।

রাত্রে বিছানায় পড়িয়া তাহার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কান্না আসিল। কেন এই কান্না সে নিজেও ভাবিয়া অবাক হইয়া গেল—। যাহাকে বাহিরে পাই নাই তাহাকে বাহিরে হারাইয়া এত ক্ষোভ কেন? যাহাকে মনের ভিতর পাইয়াছিলাম, সে ত আজও মনের ভিতর অম্লান ভাবেই আছে। তবে কী তাহার তিরোধানে তাহার স্থান শূন্য দেখিতেছি বলিয়া এ দুঃখ? না তাহার জন্য উন্মুখ-প্রতীক্ষার অবসান হইল বলিয়াই মনের এ কান্না! মানব মনের এ-অভিব্যক্তি সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তথাপি সে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল —না, মানুষের দেহ মাত্র নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর, অমর—তাহার এ জীবন শেষ নহে আরও জীবন আছে, তাহার দেহ গিয়াছে, আমার ভালবাসাত দেহাতীত ছিল, কাজেই কিসের দুঃখ? প্রতীক্ষা কর, জীবন হইতে জীবনান্তরে প্রতীক্ষা কর, খোঁজ, —তোমার প্রতীক্ষার এ আনন্দাভিযান যেন কোথাও শেষ

না হয়, শেষ হলেই কিন্তু তোমার মরণ, তোমার প্রেমের সমাধি।

পরদিন বাড়ী পৌছিয়া দেখিল তাহার পিতা তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।—

তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে উপদেশ দিলেন কিন্তু সে সংসারী হইতে কিছুতেই রাজী হইল না—সেও তাঁহার সঙ্গে তীর্থ যাত্রা করিবে।

কাজেই জায়গাজমীন কিছু কিছু বিক্রী করা হইল—তস্‌লীমের ইচ্ছা ভগ্নিদের অংশ দিয়া আর সব বিক্রী করিয়া ফেলে। কিন্তু দূরদর্শী পিতা মনে করিলেন ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন জীবনে অবসাদ আসিবে তখন হয়ত তস্‌লীম দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে, তখন তাহার কী অবস্থা হইবে। ইত্যাদি ভাবিয়া তিনি বাকী যায়গা-জমীনগুলি জামাইদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন।

মক্কা তীর্থ ভূমি। হজ্জ শেষে দলে দলে লোক ঘরমুখো ছুটিয়াছে। তস্‌লীম পিতার সঙ্গে কয়েকদিন থাকিয়া গেল।

তাহার ঘুম কী হয়?—চোখ বন্ধ করিয়া ভাবে, মানুষের জীবন-মরণ, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়!...

চৌচির

হঠাৎ চোখ খুলিতেই দেখিল বাহিরে নিঃসীম জ্যোৎস্না সমুদ্র। সে তাঁবুর বাহির হইয়া পড়িল—মুক্ত আকাশ, মুক্ত প্রকৃতি, সে যেন আলোর সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। সুদূর আকাশে নিঃসঙ্গ শশী গাল ভরিয়া হাসিতেছে, সে হাসির আলোকে সারা ভুবন ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা নাকি পরমাত্মার সঙ্গে মিশিয়া যায়, পরমাত্মার ত কোন নির্দ্দিষ্ট আরশ সিংহাসন নাই, সে ত এ-বিপুল সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়া আছে,—তবে তাহার প্রিয়াও ত এ-আলোর সঙ্গে মিশিয়া আছে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া আছে! তবে ত শুধু এ তীর্থ ভূমি তার তীর্থস্থান নহে, সারা বিশ্বই যে তার তীর্থ ভূমি। অনন্ত সন্ধানী, অনন্ত পথের পথিক মানুষ তা হইলে ত বাহির হইয়া পড়িতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে তস্‌লীম কা'বার দুয়ারে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।... কিসের এ কান্না?

তারপর সে নিস্তব্ধ নিশীথে তাহার অন্তর মথিত করিয়া ধ্বনিত হইল...'প্রভো, জন্মান্তর পরলোক, মানুষের আরও জীবন আছে কিনা জানি না, যদি থাকে সব-জীবনে, জন্মজন্মান্তরে আমাকে পাওয়ার অবসাদ থেকে মুক্তি দিও! না পাওয়ার

উন্মুখ প্রতীক্ষার ক্ষুধাই যেন আমার সহায় হয়…আমীন! এয়া রব্বীল আলমীন!'

প্রাতে তস্‌লীম পিতারসম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন…'দেখ, আমি বল্‌ছি, তুমি ঘুরে ফিরে দেশে চলে যাও, সংসারী হও, ভিটায় বাতি দেবার কেউ যে নেই, মধ্যে মধ্যে তোমার মার কবরটি জেয়ারৎ করিও এই আমার শেষ অনুরোধ… তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'আমি ত বাকী হায়াৎটুকু এখানেই কাটাবো বলে নিয়ৎ করে এসেছি, এই পূণ্য ভূমিতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।'

'না বাবা, আমি এখন কিছুদিন দেশে দেশে ঘুরব—খোদার বান্দা হলাম সার' খোদার সৃষ্টিটাইত কিছু দেখলাম না, সামান্য কতটুকু দেখে আমরা পরিপূর্ণ স্রষ্টাকে ত উপলব্ধি করতে পারি না, তাঁর পরিপূর্ণ সৃষ্টিকে দেখবার ক্ষমতা আমাদের না থাকতে পারে কিন্তু যতদূর ক্ষমতা আছে ততদূর দেখবার চেষ্টা থেকে বিরত হব কেন? আমরা তাঁকে দেখি সীমাবদ্ধ সৃষ্টিতে, তাই আমাদের ভক্তি ও হয় সীমাবদ্ধ। বহুরূপে এবং সৃষ্টির বহু-ভঙ্গিমতায় স্রষ্টার যে পরিচয় তাহাই ত পরিপূর্ণ পরিচয়, তা' হতে যে ভক্তির জন্ম তাহাই ত পরিপূর্ণ ভক্তি। তাই আমার মনে হয়

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই মানুষের অসীম ·তীর্থ ভূমি।' তাহার পিতা এ সব কিছু বড় একটা বুঝিলেন না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তস্‌লীম ইহা বুঝিয়া আবার বলিল—'আজ দিকে দিকে মুসল-মানদের মধ্যে যে নবজীবনের সঞ্চার হচ্ছে তার জন্য আমাদের হক্‌ত অনাদায় রয়ে গেছে—অন্ততঃ তা নিজের চোখে দেখে হলে ও জীবনটা সার্থক করি। তারপর বেঁচে থাকলে হয়ত দেশে যাব।' পিতা পুত্রের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উভয়ের গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল—উষর মরুভূমির বুকে!

বিদায় বেলাকে যতই দীর্ঘ করিবে ততই পিতার কষ্ট। তস্‌লীম তাড়াতাড়ি পিতার পদধূলী মাথায় তুলিয়া লইয়া বিশ্বের অনন্ত পথে নিরুদ্দেশ বাহির হইয়া পড়িল।—

o o o
o o
o

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	৬	ব্যাঙ্গ	ব্যঙ্গ
৫৪	৫	জ্বলল্‌জ্বল্‌	জ্বল্‌জ্বল্‌
৫৫	১৪	সদৃশ্যা	সদৃশা
৫৬	১	দোষারূপ	দোষারোপ
৭৪	১৪	ছাই ছাপা	ছাই চাপা
৭৯	১৫	লঠিল	উঠিল
১০০	১৭	নিংসঙ্গ	নিঃসঙ্গ
১০১	৮	ইত্যাবি	ইত্যাদি
১০১	৯	চিটি	চিঠি
১০২	৬	দীর্গতর	দীর্ঘতর
১০৫	১৬	বিসদৃশ্য	বিসদৃশ
১১১	৮	পূণ্য	পুণ্য
১১১	১৭	ভ্রষ্টার	স্রষ্টার